বাদশা - বেগম - নফর

বেদুইন

ইস্টলাইট বুক হাউস
২০, স্ট্র্যাণ্ড রোড · কলিকাতা-১

আমার কন্যা
সাথীর স্মৃতিতে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

পথে প্রান্তরে ১ম পর্ব

পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব

যশাইতলার ঘাট

কোন এক রাতে

তিস্তার চরে

এই শহরে

রুপোতি

কবি কঙ্ক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

বাদশা
বেগম
নফর

১

তিরিশ বছর।

ঠিক তিরিশ নয়, কাছাকাছি কোন সময়ে পদ্মার কিনারায় বহতি সোতার মোহনায় বালির চর জেগে উঠল। পদ্মার খরস্রোতেও বাঁক ধরল।

লোকে বলে নদী, ঠিক নদী নয়, সোতা। মোহনা ছিল পদ্মায়। মোহনায় বছরের পর বছর ধরে পলি আর বালি জমতে জমতে সোতার স্রোত আটকে গেছে। সোতার বুক শুকিয়ে আসছে দিন দিন।

তিরিশ বছর আগেও পদ্মার বুক বেয়ে বেপারিদের নৌকা প্রথম নজর করত পানসিপাড়ার ঘাটে, তারপর বেসাতি নিয়ে আসত সোতার বুক বেয়ে ছোট শহরে। ফিরবার সময় নৌকায় পাট বোঝাই দিয়ে ফিরে যেত। এখন আর বেপারিদের বড় বড় বজরা আসে না। পানসিপাড়ায় নৌকা বদল করে মাল চালান দেবার খরচ পোষায় না। দশ বছর আগেও বর্ষায় চর ডুবলে ছোট ছোট নৌকা আসত, সাথে আসত ভিন জেলায় তৈরী পাটি-মাদুর, কাঁসার বাসন, জামদানি শাড়ি। এখন বন্যাতেও আর চর ডোবে না, নৌকা আসবার পথ বন্ধ। বন্দরের ঘাটে পাটের আড়ত বন্ধ হয়ে গেছে। তিন মাইল দূরে রেলের রাস্তায় আড়ত বসেছে। গরু-মোষের গাড়ি বোঝাই দিয়ে পাট এনে জমা করে, বেলিং হয়, রেলে ওঠে। বড় গাঙ্গের জাহাজে আর মাল ওঠাতে হয় না। বেপারিরা ধীরে ধীরে ভুলে গেছে নয়নপুরের বন্দরের কথা, ভুলে গেছে নদীর কিনারায় শ্রীমণ্ডিত গঞ্জের কথা।

ছোট শহর, আরও ছোট নদী। বিগতা যৌবনা নারীর মত নদী বিকৃত রূপ নিয়ে শুয়ে রয়েছে। খালবিল উপচে বর্ষার জল নদীর শুকনো বুকে আশ্রয় নিলে শীর্ণকায়া নদী কিছু দিনের জন্য নব আভরণে সজ্জিত হয়। কিন্তু বন্যার ঘোলা জল আর কল কল করে বেয়ে যায় না। পদ্মা অনেক দূর।

সবার নাম রয়েছে, নদীরও নাম রয়েছে। নদীর নাম নয়না। শহরে নতুন বাসিন্দা আসে, আবার ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘরের আশায় অন্যত্র চলে যায়।

হাকিম হুকুম বদল হয়, থানায় দারোগা সেপাই বদল হয়। তারা জিন জেলায় গিয়ে রিপোর্ট দেয়, নয়নপুরের ম্যালেরিয়া না কমলে শহর সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া উচিত।

স্রোতহীন নদীর বুকে কচুরীপানা বাতাসে দোলে, তার নীল পুষ্পগুচ্ছ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। বর্ষা পেরিয়ে গেলে নদীর শুকনো বুকে সবুজ দুর্ব্বাঘাস গজায়, গরু-ছাগল ভীড় করে। লোকে আর নদী বলে না, বলে মরা গাঙ্।

যেখানে ছিল দশ বাঁওয়েব দ, বিজয়ার দিন রাজাদের দুর্গা ভাসানো হত, সেখানে বর্ষায় একগলা জল জমে, তাতেই দেবী প্রতিমাকে ঠেসে ঠুসে বিসর্জ্জন দিয়ে ঐতিহ্য রক্ষা করে রাজার পেয়াদারা। নদীর বুকে বাইচের নৌকা আসে না, দু কিনারায় ভাসানের মেলা বসে না, গোয়াড়ি-কেষ্টনগরের পুতুল বিকোতে কুমোরাও আসে না, মতিচুরের লাড্ডু বেচতে বেহারী কাহারের দলও হৈ-হট্টগোল করে না। নদী অসার। উৎসব হুল্লোব থমকে গেছে। নদীই ছিল শহরের প্রাণ, নদীর অপমৃত্যু শহরের মৃত্যু ধীবে ধীবে টেনে এনেছে।

তিরিশ বছরের ব্যবধানে এত পবিবর্তন।

তিনশ' বছরের নয়নপুর।

নবাবী ফৌজ ছিপ ভাসিয়ে যেত, বেগমরা শয়ের করতে আসত, বড় বড় বজরায় মালগুজারি যেত। ষোল তীরন্দাজ আর গোলন্দাজের পাহারায় জমিদাররা যেত নবাব সরকাবে। তিনশ' বছব অনেক দিন, তাও পেরিয়ে গেছে, তিনশ বছর যা পাবেনি, তিরিশ বছরেব আঘাতে অবসন্ন নয়না বোধহয় অতীতেব গৌরব কাহিনী ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছে।

বিগত দশ বছর ধরে সবাই শুনেছে, সরকার পানসিপাড়ার কিনারায় মখদুমপুরের তিন মাইল চর কাটিয়ে আবার নয়নাকে পদ্মার সাথে জুড়ে দেবে। মন্ত্রীরা এসেছে, বারবার আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু মখদুমপুবের এক কোদাল বালিও কাটা হয়নি। জরীপ হয়েছে, নক্সা হয়েছে, যা হবাব তা আর হয়নি। কবে যে হবে স্বয়ং সরকারও তা বলতে পারে না, সাধারণ লোকতো দূরের কথা। তাবা আশার কথা শোনে, কানাকানি করে, দু ছিলেমের জায়গায় পাঁচ ছিলিম তামাক পোড়ায়। লাল ফিতার তলা থেকে হুকুম আর বের হয় না। আমিনের নক্সায় ঘুণ ধরে।

শহরের শেষে ফৌজদারপাড়া। নবাবের ফৌজদার আর তার পেয়াদা বরকন্দাজ কোন সময় বাস করত ঐ মহল্লায়। সে সব ইতিহাস। সে ফৌজদারের ফৌজ-তো নেই-ই, নেই একখানা ইঁটের টুকরো, কোন চিহ্ন রেখে যায়নি নবাবের শেষ ফৌজদার। নামটা শুধু রয়ে গেছে। এমনি ধারা নাম রয়েছে পিলখানার। পিল আর সারি বেঁধে পিল-পিল করে দামামার তালে তালে পা ফেলে সাটিন জড়ির পোষাক গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় বের হয় না। জমিদারদের দু তিনটে বুড়ো পিল দাবার ছকের পিলের মত ধীরে ধীরে পা-ফেলে বট-অশ্বথের চারা কাটতে যায়। মাহুতরা মাঝে মাঝে 'মাইল-মাইল' চিৎকার করে আর অঙ্কুশ দিয়ে মাথায় খোঁচা মারে।

ফৌজদারপাড়ার কোনায় নদীর ঘাটে কালীর স্থান। লোকে বলে; কালীর থান। শহরে কলেরা সুরু হলে বারোয়ারী রক্ষাকালী পূজা হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে জেলে পাড়ার বুড়ো-ছোঁড়ার দল কাঠের মকর ঘাড়ে করে নিয়ে আসে, থানে বসায়, পূজা হয়, বলি হয়, আবার নিস্তব্ধতা ফিরে আসে। নয়নপুরের প্রাণে শুধু স্পন্দন জাগায়, সজীবতা সৃষ্টি করে না।

নদী ভাটিতে এগিয়ে গেছে। আম কাঁঠালের ঝোপে বোরেগীর দ। সেখানে রাজাদের বাসন্তী প্রতিমা বিসর্জ্জন হত। এখন আর হয় না। দ'-এ চর জেগেছে, চরে এখন তৈরী হয়েছে ইদ্‌গাহ্‌। ইদের জমায়েত হয়, খোতবা পড়ে ইমামসাহেব, নমাজ পড়ে তার অনুসারীর দল।

ইদ্‌গাহের শেষ কোনায় আনন্দরায়ের ভিটা।

লোকে বলে, আন্দুরায়ের জাঙ্গাল।

শহরের মাঝ দিয়ে নদী। নদীর এপারে ওপারে জরাজীর্ণ শহরের কঙ্কাল, লোহার সেতু তার কটিবন্ধ। লোহার সেতু পেরিয়ে সোজা রাস্তাটা রাজবাড়ির পরিখার সামনে এসে থেমে গেছে।

নবাব নাজিম নেই, তাদের হাতে গড়া পাঁচলাখী, দশলাখী জমিদার রয়েছে আজও। তারাই রাজা মহারাজা। রাজত্ব নেই, প্রজা আছে; গৌরব নেই, পদবী আছে; সেপাইশান্ত্রীর খরচ নেই, বিলাসের স্রোত রয়েছে; প্রজানুরঞ্জন নেই, প্রজাপেষণ আছে। সচল বুদ্ধির রাজা মহারাজা কলিকাতায় আশ্রয় গড়ে নিয়েছে। তাদের নিজস্ব গৃহে ইমারত আছে, মানুষ নেই; তোপ আছে,

গোলন্দাজ নেই ; সোয়ারী বংশ আছে, ঘোড়া নেই ; দেওয়ান আছে উজির আছে, হুজুর নেই নকীব নেই। যা আছে আর যা নেই সব মিলিয়ে রাজ্যহীন রাজার মহিমা আজও বজায় রেখেছে। যারা আছে তারা স্থানু, যারা নেই তাদের জন্য আপশোষ কেউ করে না। রাজা মহারাজার পালপার্বন আছে, জুলুমবাজি আছে, আর আছে টি-মডেলের ঝরঝরে গাড়ি। সেই গাড়ি চেপে দেওয়ান সেলাম দিয়ে আসে হাকিমদের, সদরে খাজনা পৌঁছায়। রাজার ছেঁড়া পতাকা পত্ পত্ করে উড়ায়।

রাজার পরিখা ভরাট হয়ে আসছে। কচুরিপানায় ঢাকা পড়েছে পরিখার স্বচ্ছ কাচের মত জল। বাজপ্রাসাদের পলেস্তারা খুলে পড়ছে, চুণকাম করবার লোক নেই, হয়ত পয়সাও নেই। কলিকাতার বিলাসের জোগান দিতে ব্যয়ের অঙ্ক স্ফীত হয়, রাজধানী রক্ষার অর্থও থাকে না।

রাজবাড়ি শশ্মানের মত ঝিমিয়ে থাকে।

দেবসেবার কাঁসর ঘণ্টা না বাজলে ঐতিহ্যটুকুও মানুষ বোধহয় ভুলে যেত।

নয়নার বুক শুকিয়েছে, নয়নপুবের গরিমাও লুপ্ত হয়ে আসছে। রয়েছে কতকগুলো ঘব বাড়ি। অতীতেব ঐশ্বর্য-ঐতিহ্য ঐ ঘর বাড়িকে কেন্দ্র কবে এখন যা কিছু প্রাণের স্পন্দন জানাচ্ছে।

এমনি ধারা পড়ে বয়েছে আন্দুবায়েব জাঙ্গাল।

অনেকেই প্রশ্ন করেছে আন্দুবায়ের জাঙ্গাল কার ?—উত্তর পাওয়া যায়নি। দাবীদার হয়ত বা কেউ আছে, কিন্তু লোকচক্ষুব সামনে এসে দুই শত বৎসবেও কেউ দাবী জানায়নি।

হঠাৎ একদিন ভাদুড়ি বাড়ির জগলা তার দলবল নিয়ে দাবী জানিয়ে বসল, এ জাঙ্গাল আমার।

প্রতিবাদ কেউ করল না। প্রয়োজনও কারুর ছিল না।

কানাঘোঁষা শোনা গেল, ফার্সীতে লেখা আসল দলিল রয়েছে জগলার কাছে। জগলা আসলে আন্দুবায়েব দৌহিত্র ঘরেব দূবতম বংশধর।

রক্তের দাবীর চেয়ে জগলার বড় দাবী তার দেহের শক্তি এবং কতকগুলো শক্তিমান অনুচর।

কিন্তু জগলার দাবীকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দুগ্ধহীন গাভীর মত অনাদৃত রয়ে গেল আন্দুরায়ের ভিটা।

কারণ স্বরূপ অনেকে আবিষ্কার করল, নিশ্চয়ই কার্সী দলিলের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি ; কেউ কেউ বলল, ঘরের কড়ি না ফেললে বেতগুঁড়াওড়া বনের রাজ্যে শেয়াল পণ্ডিত হওয়া ভিন্ন গতি নেই বুঝেই জগলা স্বীয় আশ্রমে ফিরে গেছে। দাবীদার বাঁশগাড়ি করতে পারে নি। ট্যাঁকের জোর কম।

আন্দুরায়ের জাঙ্গালের গায়ে গা দিয়ে সতীশরায় বাস করে। আটশ' বছরের কুলুজি তালপত্রে লেখা, তারই হকনামায় সতীশরায় জমজমাট ভাবে বাস করছে। কেউ প্রশ্ন করলে আঙ্গুল গুণে উনত্রিশ পুরুষের নাম বলে দেয়। এই ধর, আমি সতীশ, আমার ছেলে যতীশ, আমার বাবা রাজনারায়ণ, ঠাকুরদা গৌবনাবায়ণ, বাবার ঠাকুরদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অত শুনবার ধৈর্য থাকে না।

বৃদ্ধ সতীশরায় হাসতে হাসতে বলে, আরে ছোঃ, আন্দুরায় তো নবাব সরকারের গোলাম ছিল, আর আমবা সেই সামন্ত সেনেব যুগ থেকে হরিশপুরে বয়েছি। আমাদের প্রথম পুরুষ হরিশ ঠাকুরের নাম নিয়েই না হরিশপুর।

সেন গেছে, দাস এসেছে ; দাস গেছে খলজী এসেছে, এমনি ভাবে শত শত বছবে কত গেছে কত এসেছে, রয়েছে শুধু রায়বাড়ি। গর্ব করবার মত ঐতিহ্য তাদেব। তালপাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সতীশরায় জানিয়ে দেয়, মিথিলা নয়, উৎকল নয়, দক্ষিণী নয়, খাস কাণ্যকুব্জ থেকে এসেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ।

সতীশরায়ের ঠাকুবদা পাকা ইমারত গড়েছিল, শ' বিঘেব খাসের চাষ করেছিল, আজও সবই আছে। শুধু ইমারতের ইঁটের গায়ে পলেস্তারা দেবার অর্থ ছিলনা। পাল-পার্বন বজায় রেখে, ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা করতে করতেই ঘড়াব জলে তলানি পড়ে গেছে। বিশেষ করে ছেলেকে ইংরেজের পাঠশালায় পড়তে দিয়ে আর্থিক সমস্যাটা আবও কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সতীশবায় আশা কবেছিল ইংরেজী পড়া ছেলে নিশ্চয়ই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। হবার মত আবহাওয়াও সৃষ্টি না হয়েছিল এমন নয়, জেলার সদর থেকে দু-দুবার সব-রেজিষ্টারের চাকরিতে ডাক এল, তিনবাব ডাক এল দারোগাগিরিব কিন্তু পুত্র যতীশ রাজ অনুগ্রহ গ্রহন করতে রাজি হয়নি।

তা হলে কি করবি ? সতীশরায় হবু-ডেপুটি পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করল।

যাই করি, গোলামি নয়।

যতীশ সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা শুনেছে, ব্রাহ্মসমাজে আসা যাওয়া করেছে, তখন স্বদেশী'র চিন্তায় রক্ত তার টগ্‌বগ্‌ করছে। দারোগাগিরি করবার বৃত্তি তার ছিলনা, বলতে গেলে এমন কাজ সে স্বচক্ষেও দেখত না।

অবশেষে গ্রামে ইস্কুল বসালো যতীশরায়। ইস্কুলের নাম দিল বিদ্যামন্দির। ছাত্র এল, শিক্ষক এল কিন্তু ইস্কুল রক্ষা করবার মত অর্থ এল না। যখন যতীশের সামর্থ্য ফুরিয়ে এল, তখন দরজায় দরজায় ভিক্ষা করা ভিন্ন ইস্কুল বাঁচাবার পথ আর রইল না।

সমাজসেবার প্রথম পদক্ষেপে এমন কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে একথা কলেজ ফেরতা নবীন যুবক যতীশ জানত না, যখন জানল তখন পরিহার করবার পথ বন্ধ।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আবেদন নিবেদন করবার পর ভিক্ষা যৎসামান্য পাওয়া গেল। যতীশ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এবার আরম্ভ হল সমাজসেবার দ্বিতীয় পর্যায়।

এঁদো পুকুর-ডোবা সংস্কার, ঝোপঝাড় পরিষ্কার আরম্ভ হল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে করতে কাটারির আঘাত গিয়ে পড়ল আন্দুরায়ের বেতশ্যাওড়ার ঝোপে।

জগলার আশ্রম কাশিমপুরের শশ্মানে। গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে কাশিমপুরকে কিভাবে কৈলাশে পরিণত করা যায় তার চিন্তায় বিভোর হয়ে জগলা দিন কাটাচ্ছিল। পরিকল্পনাও হয়েছিল নিখুঁত। বিপদ হয়েছে নিতাই আর ফটিককে নিয়ে। অনুচরদের মধ্যে সবচেয়ে অনুগত এই দুইজন যথাক্রমে নন্দী ভৃঙ্গীর স্থান গ্রহন করলেও অতি প্রয়োজনীয় দুইটি সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পারায় জগলা সবিশেষ উৎকণ্ঠিত। অনেক চেষ্টায় বাঘছাল আর ডমরু সংগ্রহ করতে না পেরে নিতাই এবং ফটিকও বিশেষ খুশী মনে চলাফেরা করত না। অবশেষে জগলা পাতি দিল, শেয়াল মার। বাঘছালের অভাবে শৃগাল চর্ম বিধেয় আর ডম্বুরুর অভাবে শিঙা। কেননা, শাস্ত্রে মধুর অভাবে গুড় দেবার বিধি রয়েছে।

নিতাই এবং ফটিক এই দ্রব্য সংগ্রহে সেদিন বের হয়েছিল। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে নিতাই এসে গুরুর পা জড়িয়ে ধরল।

জগলার ধ্যান ভঙ্গ হল। ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি সংবাদ ?

সর্বনাশ !

জগলা থতমত খেয়ে গেল। একবার গাঁজার দারোগার গুঁতো খেয়ে সে গ্রাম ছেড়েছে, আবার শশ্মান ছাড়তে হবে নাকি এবার!

জগলার রক্তচক্ষু কয়েকবার বিঘুর্ণিত হল। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, হর হর বোম্ বোম্।

নিতাই আবার বলল, সর্বনাশ।

কি সর্বনাশ ?

প্রভু, যতেরায় আন্দুরায়ের ঝোপ কাটছে।

বেশ করেছে! তোর বাবার কি।

জগলার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। দারোগা নয়, সেপাই নয়, যতে মাত্র। অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে জগলা হুঙ্কার ছাড়ল, আমার ত্রিশূল।

ভয় তখন ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছে। হর-হর বোম্-বোম্ করতে করতে অবিলম্বে সশিষ্য জগলা ইস্কুলের দরজায় হাজির হল।

জগলা হাঁক দিল, যতে।

যতীশ জগলাকে ভালভাবেই জানে। তার রুদ্রমূর্ত্তিকে সবাই ভয় করে। যতীশও ভয় করে। নিরাপদ দুরত্ব রক্ষা করে বলল, জগাকাকা, আপনি এই দুপুর বেলায় ?

জগলা এই আপ্যায়নে মোটেই তুষ্ট হল না। সে বজ্রকণ্ঠে বলল, তুই আমার জমিতে হাত দিয়েছিস কেন ?

আমি! আপনার জমিতে ? না তো।

একশোবার আমার জমি। আন্দুরায়ের দ্বাদশপুরুষ আমি। আমার জমি নয় তো তোর ?

আন্দুরায়ের জমি তো আমি দখল করিনি।

তা হলে গাছ কাটল কে ? ওসব, জানিনা, তুই আমার জমিতে পা দিবি না, তা হলে মঙ্গল হবেনা। জগাঠাকুর ভালোর ভাল বুঝলি। দেখেছিস বাবার ত্রিশূল!

যতীশকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে জগলা সদলে প্রস্থান করল। ঘটনাটা নির্বিঘ্নেই ঘটল। যতীশও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বিধাতা পুরুষ এই সামান্য ঘটনার সাথে অদৃশ্য দুর্ভাগ্যের যোগসূত্র যুক্ত করে যতীশরায়ের ভবিষ্যত স্থির করে দিল। ঘটনাটা নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে সতীশরায়ের কানে পৌঁছাল। সন্ধ্যাবেলায় সতীশরায় জিজ্ঞাসা করল, তা হলে সত্যি !

যতীশ জবাব দিল না।

শোন যতীশ, ঐ আন্দুরায়ের ভিটা আমার চাই। তার জন্য প্রস্তুত হও।

যতীশ পিতার পদস্পর্শ করে রক্তিম বদনে প্রতিজ্ঞা করল, ঐ জমি যেমন করে হোক সে নেবেই নেবে।

আন্দুরায়।

আনন্দরায়। এগার মৌজার জমিদার। নদীর দু কিনারায় এক রপ্তে এগার ক্রোশ তার জমিদারী।

ঠোলাকাটা বামুন রাতা রাতি জমিদার হয়ে বসেছে, নবাব সরকারে মাল গুজারি পাঠাচ্ছে।

যতীশ কল্পনার চোখে দেখতে পেল, তিন্‌শ বছর, মাত্র তিনশ বছর আগে।

গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ চুণীঘাটের মাথায় নিশানা গম্বুজে দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট উজ্জল তার চেহারা। চেয়ে আছে অনেক দূরে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তার রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা আনন্দরায়। তার জীবনের একমাত্র সম্বল গৌরী, সেও নেই। জামাতা সোমনাথকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের পুরীতে, সেও সপরিবারে নিখোঁজ হয়েছে। আনন্দরায়ের আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেছে।

বাক্যহীন আনন্দরায় চেয়ে রয়েছে দূরে, অনেক দূরে। হয়ত অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতকে দেখতে ব্যাকুল ভাবে দৃষ্টি মেলে আছে। ত্রিকালের প্রতিভূর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে আন্দুরায়।

বন্ধনহীন আনন্দরায়। আজ কি শিউরে উঠল সে। অতীত বুঝি ভ্রূকুটি করল।

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী।

ঢাকা থেকে খাস কাচারি এনে পত্তন করেছে মুর্শিদাবাদে।

বাদশাহী লড়াইয়ের খরচা পোষাতে মুর্শিদ নাজেহাল। মাঝে মাঝেই নিজেকেই ছুটতে হয় লাটের টাকা আদায়ে।

নয়নার বুকে মাঝে মাঝেই নবাবী বজরা আর ছিপের ভীড় জমে। বন্দরে বন্দরে, গঞ্জে গঞ্জে সেপাইদের তাঁবু পড়ে। পার্বত্য মুষিক দমনে আলমগিরী খাজনা উশুল করে মুর্শিদকুলী খান।

আজও যাকে চুণ্ডীঘাট বলে, তারই পাশে পুরাণ বাড়ির শিবতলা। সেখানে ছিল শান বাঁধান ঘাট। গ্রামের মেয়েরা স্নানে আসত, নদীর স্বচ্ছ জল কলসী বোঝাই করে নিয়ে যেত। তারই কিনারায় বাস করত গরীব বামুন আনন্দরায়। যজমানী তাব পেশা, ক বিঘের চাষ তার সম্বল।

বামুনের বামনী তিন্তিরিপত্রের ঝোলও রাঁধে না অতিথি অভ্যাগত এলে ফিরিয়েও দেয় না।

বামুনের মেয়ে জন্মাল।

দিনক্ষণ দেখে তার নাম রাখলো গৌরী।

শশীকলার মত গৌরী বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপর দিকে ব্রাহ্মণী দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে। বামুন শঙ্কিত হয়ে উঠল।

তারপর একদিন বিনা নোটিশে ব্রাহ্মণী বিদায় নিল। আনন্দরায় শিশু কন্যাকে নিয়ে পড়ল মহা সমস্যায়। প্রতিবেশিরা বলল, বিয়ে কর আন্দু-ঠাকুর।

আন্দুঠাকুর ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা করল, এ জীবনে আর বিবাহ করিব না।

দুর সম্পর্কের বৃদ্ধা পিসিকে ডেকে এনে গৌবীকে তাব হাতে তুলে দিয়ে আনন্দরায় নিশ্চিন্ত মনে পুঁথি-পত্তরে মনোনিবেশ করল। মা-হারা মেয়ে পিতার অত্যধিক আদবে এবং ঠাকুমার অত্যধিক অনাদরে বড় হতে থাকে। গোটা গড়া কোমরে জড়িয়ে সাত বছর বয়স থেকেই গৌবী গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি কাজে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল। শরীর মজবুত হল, ন বছরের গৌবী তের বছরের কিশোরীর মত পুষ্ট হয়ে উঠল।

পোড়াঘাটির অনন্ত ভাদুড়ির মায়ের বার্ষিকী। ব্রাহ্মণ ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা হয় প্রত্যেক বছর। এবারও হয়েছে। আনন্দরায় আহার শেষ করে হুঁকোয় টান দিচ্ছিল এমন সময় বার তের বছরের ফুট ফুটে একটি কিশোর এসে দাঁড়াল সামনে।

অনন্ত ভাদুড়ির ইঙ্গিতে কিশোর প্রণাম করল আনন্দরায়কে।

উৎফুল্লভাবে অনন্ত ভাদুড়ি বলল, আমার তে-তরফের ছেলে।

আনন্দরায় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল।

অনন্ত বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। একটা কেন সাতটা তরফ সে পালন করতে পারে। বাপ বেঁচে থাকতেই পরগণা প্রতাপবাজুর মুন্সী নরেন্দ্রনাথের কন্যা তারামযীর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তারার বয়স তখন দশ। দেখতে দেখতে আরও ছটা বছর কেটে গেলেও তারার কোলে সন্তান আসার কোন সম্ভবনা দেখা গেল না। বংশনাশ নিশ্চিত ভেবেই বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্যদের মেয়ে শ্যামার সাথে দ্বিতীয়বার পুত্রের বিয়ে দিয়ে অনন্তের পিতা নিশ্চিন্ত হল। বুড়োর আশা ছিল মৃত্যুর পূর্বেই শ্যামার কোলে সন্তান দেখবে, কার্যকালে দেখা গেল শ্যামার সন্তান হবার কোন-ই সম্ভাবনা নেই।

বুড়ো অনন্তকে ডেকে বলল, বাপুহে আর বেশি দিন বাঁচব না, কিন্তু দুঃখ নিয়েই মরতে হচ্ছে। নির্বংশ হতে হবে তা কখনও ভাবিনি। আমার ইচ্ছে, কোন ডাগর মেয়ে দেখে তোর সাথে বিয়ে দেই। তুই অমত করিস না।

অনন্ত তারাকে খুবই ভালবাসত। কেবল মাত্র সন্তান পাবার আশায় এবং পিতার তুষ্টিসাধনের জন্য শ্যামাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে শ্যামা ও তারার রেষারেষিতে অনন্ত বিপন্ন বোধ করছিল। তাই সহসা পিতার এই অনুরোধ অথবা আদেশ মেনে নিতে পারল না। সামান্য প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনাটা চাপা দিতে চাইল।

কিন্তু মৃত্যু শয্যাশায়ী পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সাত দিনের মধ্যেই হাজরাপুরের অক্ষয় মজুমদারের অর্ধ ডজন কন্যার জেষ্ঠা ষোড়শী ক্ষান্তমণির পাণি ধারণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

গরীবের ঘরের মেয়ে ক্ষান্তমণি। শ্বশুর বাড়ির প্রাচুর্যে কিছুকালের মধ্যেই ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আঠার মাসের মাথায় সোমনাথকে অনন্তের কোলে তুলে দিয়ে নিরানন্দ পুরীতে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিল। কিন্তু যিনি নির্বংশ হবার আতঙ্কে পুত্রকে বহু বিবাহের উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি এই বংশধরকে দেখবার অবসর পেলেন না। সোমনাথের আগমনের পূর্বেই ইহজগতের দায় দেনা মুক্ত হয়ে তিনি পরজীবনের ধান্দায় রওনা হলেন। রৌরবভীতি নিয়েই রৌরবের পথে পাড়ি জমালেন।

ক্ষান্তমণির গরব বেশি। সে ছেলের মা। কিন্তু এ গরব ক্ষণস্থায়ী। শীঘ্রই দেখা গেল তারা ও শ্যামা সেই গরবের অংশীদার হয়ে বসেছে। কয়েক বৎসরেই মা ষষ্ঠীর কৃপায় অনন্তের গৃহের আনাচে কানাচে শিশু ও শিশুর ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু দেখাও যেত না এবং শোনাও যেত না।

আনন্দরায় অনন্তকে চুপি চুপি ডেকে বলল, আমার মেয়ে গৌরীকে তোমার ঘরে দিতে চাই ভাদ্‌ড়ি মশাই।

অনন্ত মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, বয়স যে বড় কম। বার মাত্র পেরিয়েছে।

আমার মেয়েই বা কি বড়, সেও তো দশে পা দিয়েছে।

নানা বিবেচনার পব বিয়ের কথা পাকা হল। যথাকালে বিয়েও হয়ে গেল।

ষোল বছরের গৌরীর কোলে এল মালবিকা।

মালবিকার মুখ দেখেই অকালে অনন্ত ভাদুড়ি বিদায় নিয়েছে। তারা-শ্যামা-ক্ষান্তমণি নিজ নিজ সন্তানের ভাগ বাঁটোয়ারা শেষ করেছে। অনন্ত ভাদুড়ির তিনশ বিঘে জমির এগার অংশের এক অংশ পেয়েছে সোমনাথ। আগামী দিনেব এগাবগুণ অংশের হিসাব করেই অনন্ত ভাদুড়ি তিন তরফ সৃষ্টি করেছিল, নইলে এত সহজে ভাদুড়ি বাড়িব ঐশ্বর্য ভেঙ্গে নিশ্চয়ই পড়ত না।

অনন্দবায় পুঁথি-পত্তব সম্বল করে দিন কাটায়। কখনও কখনও গৌরী আসে মালবিকাকে কোলে নিয়ে। নাতনীর অত্যাচারে পুঁথি-পত্তর তুলে রেখে আনন্দরায় বাস্তবত কয়েক দিন বিশ্রাম নেয়। নদীর কিনারায় নাতনীর হাত ধবে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে বেড়ায়।

এবাব অনেক দিন পরে গৌরী এসেছে। বাপের কাছে এলে গৌরীর কাজ বাড়ে। মেয়েকে বাপের হেপাজতে বসিয়ে পাড়া টহল দিতে বের হয়। সকালবেলায় নদীতে ঝাঁপাই পেটায়, দুপুরে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে আমতলায় কাঁচা আম কুড়িয়ে বেড়ায়। সাত দিনেব ছুটি। সাত দিনে সে সাত বছর পিতৃগৃহ বাসের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের এমন সুযোগ সে মোটেই ছাড়তে চায় না।

নবাবী ছিপ চলেছে। মালকোষায় তোপ, শালকোষায় বেগমদের বাঁদি আর নফর, মাঝখানটায় বজরার ছাদে নবাব স্বয়ং; কামরায় কামরায় পর্দা,

পর্দার আড়ালে বেগমদের দল। বাতাসের জোর নেই, মাল্লা মাঝি দাঁড় টানছে। ছিপ আর কোষা চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

সায়াহ্নে গ্রামের মেয়েরা নদীতে গা ধুতে আসে। নদীর ঘাটে রূপের মেলা বসে। ছোটবেলায় গৌরী নদীতে স্নান করতে আসত, ঝাঁপাই পেটাত। উন্মুক্ত পরিবেশে অনেক দিনকার পুরাতন অভ্যাস মনের কোণে চাঙ্গা দিয়ে উঠে। গৌরী বিকেলে গা ধুতে এসে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝাঁপাই পেটাতে নেমে পড়ল নদীর স্বচ্ছ জলে। কেউ জানত না নবাবী বহর এগিয়ে আসছে।

দূরে নবাবের বহরী ফৌজ দেখে তাড়াতাড়ি গৌরী সাঁতরে এল ডাঙ্গায়। এসেই ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে দিল ভোঁ দৌড়। নিমেষের মধ্যে স্নানার্থী মেয়েদের আর নদীর ঘাটে দেখা গেল না। প্রশান্ত পড়ন্ত বেলায় ঘাটের কলকণ্ঠ নিমেষেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

নবাব তখন বজরার ছাদে বসে আলবোলায় অম্বুরি তামাকের ধূমপান করছিল। পলায়মানা নারীর দল তার দৃষ্টি এড়ায়নি, বিশেষ করে দৃষ্টি পড়ল যুবতীদের ওপর।

গৌরী তাদেরই একজন।

নকীব পেয়াদা ডেকে নবাব আদেশ দিল, খুব্ সুরত ওই সব মেয়েদের তালাস কর।

খোঁজ নিয়ে পেয়াদা ফিরে এল।

রাতের বেলায় আনন্দরায়ের তলব হল নবাবের বজরায়।

আনন্দরায় ভয়ে জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়াল নদীর ঘাটে। ঘাটেই বজরা বাঁধা।

নবাব তখন চোখে সুরমা টেনে বেগমদের মসলিন পরিয়ে রূপের জৌলুস পরীক্ষা করছিল। খোজা প্রহরী এসে পেশকারের আর্জি পেশ করল।

আনন্দরায় পেশকারের সামনে হাজির হয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছিল, নবাব তখনও অনেক দূরে। শুধু আর্জি পেশ হয়েছে তার কাছে।

পেশকার গুছিয়ে গুছিয়ে যা বলল, তার অর্থ অতি সহজ। সংক্ষেপে জানিয়ে দিল নবাব হারেমে একটি সিট খালি আছে। ফিল্-ইন্ করবার সৌভাগ্য খোলা রয়েছে গৌরীর জন্য। বিনিময়ে নদীর দুকূলে এগার মৌজার সনদ।

এসব শোনা কথা। তারপর কি হল কেউ জানেনা।

আনন্দ রায় কোনকথা বলেনি, মনে মনে অভিসম্পাত দিতে দিতে গৃহে ফিরে এসেছিল নিশ্চয়ই।

এ খবর জানত পেশকারের কারপরদাজ আছমত সেখ। পরদিন সকাল-বেলায় গাঁয়ের মুদির কাছে বসে বেসামালে কাহিনীটুকু বলে গিয়েছিল। নইলে কেউ হয়ত জানতে পারত না গৌরীর অদৃশ্য হবার কাহিনী। সেই দিনই বিকেল বেলায় কাশিমপুরের শশ্মানে কাপড় জড়ানো লাশ জ্বালান হল। লোকে শুনল, গৌরী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তাকেই পোড়ান হয়েছে বিকেলবেলায়।

দুষ্ট লোকে কানাকানি করে। মুদির শোনা কথা শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হল ধীরে ধীরে। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। নবাবের ছিপ তখন অনেক দূরে।

কেউ বলল, খড়ের বোঁদা জ্বালান হয়েছে। কেউ বলল, বিদেশিগ্না চামারের বুড়ি মা কাল রাতে মরেছে, তারই লাশ জ্বালান হয়েছে। আসল কথা কেউ জানল না।

মাস না পেরোতে নবাবী ফরমানের দয়ায় আনন্দরায় এগার মৌজার রাজস্ব আদায় করতে লাগল। তখন তার প্রবল প্রতাপ, দুষ্ট লোক শিষ্ট হল। সোমনাথকে ডেকে পাঠিয়ে স্থান করে দিল নিজের গৃহে, সমগ্র সম্পদের চাবিকাঠি তুলে দিল তার হাতে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সোমনাথ আশ্রয় নিল আনন্দরায়ের আনন্দধামে। কিছু কালের মধ্যেই লালোরের চৌধুরী বাড়ির রমা এল সোমনাথের ঘর করতে। গৌরীর স্থান পূর্ণ করল রমা। আনন্দরায়ের মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারল না এই স্থান পূরণে সে কতটা খুশী হয়েছে।

প্রৌঢ় আনন্দরায় তদবধি রইল দোতালার চিলেকোঠায়, বুকের সাথে জড়িয়ে নিল মালবিকাকে। রমার সাথে তার সাক্ষাত হত না কোন সময়ই।

মালবিকা বড় হতে থাকে।

আনন্দরায় সাবধানে সোমনাথের কাছ থেকে মালবিকাকে সরিয়ে রাখে। সব সময়ই তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। মাঝরাতে মাকে খুঁজতে থাকলে আনন্দ-রায় বুকের সাথে তাকে চেপে ধরে।

বছর বছর মাল গুজারি দিতে যায় সদরে। সঙ্গে যায় মালবিকা। এবারও মালবিকাকে সাথে নিয়ে চলল সদরে। লালবাগের গোলাপ বাগিচায় কার কোলে তাকে তুলে দিয়ে একাই আনন্দরায় ফিরে এসেছিল কাউকে বলেনি। লালবাগের আমগাছের ছায়ায় মালবিকা ঢাকা পড়ে গেল সবার অজ্ঞাতে।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করতেই বলল, মালু মারা গেছে।

কি হয়েছিল, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মত সাহস ছিল না সোমনাথের। শুধু সংবাদটুকু বহন করে রমার কানে তুলে দিল। রমা কাঁদল, সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

গৌরীর সংবাদ জটিলতা সৃষ্টি করেছিল, কালের প্রবাহে গৌরীর কথা লোক ভুলে গেছে, মালবিকাও আর নেই। আনন্দরায় হাত পা ঝাড়া হয়ে বসল।

সোমনাথ বিব্রত বোধ করতে লাগল।

আনন্দরায় গিয়েছিল মহাল তদারকে। ঘাটে যখন ফিরতি ছিপ লগি বসাল, তখন আনন্দরায়ের পেছনে নামল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা একটি কিশোরী। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, আনন্দরায় পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে গৃহে ফিরেছে।

সোমনাথ নিভৃতে রমাকে ডেকে বলল, শুনেছ ?

শুনিনি, দেখেছি, বলে রমা আতঙ্কিত ভাবে সোমনাথের পাশে এসে বসল।

কি করব ভাবছি।

ভাবনার আর কি আছে, এবার চাটি বাটি ওঠাও।

সোমনাথের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হুঁ।

একদিন গভীর রাতে ষোল দাঁড়ের ছিপ এসে লাগল ঘাটে। অতি গোপনে গভীর রাতে সোমনাথ রমার হাত ধরে নৌকায় উঠল।

সোমনাথ নিখোঁজ হল।

এত সম্পদ ভোগ করবে কে ? সন্তান চাই।

আনন্দরায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বছর যেতে না যেতেই আবার আনন্দরায় ফিরে এল মহাল থেকে আদায় তশীল করে, সাথে এল অবগুণ্ঠন টানা আর একটি কিশোরী। খবর ছড়িয়ে পড়ল।

বিধাতার আক্রোশ শেষ হয়নি। আনন্দরায়ের সন্তান লাভ আর হল না।

দোতালার অলিন্দে দাঁড়িয়ে আনন্দরায় কার যেন প্রতীক্ষা করত। শেষ রাতে অলিন্দ থেকে নেমে এসে প্রদীপ জেলে বসত নিজেব ঘরে। পুবাতন পুঁথি পত্তর নিয়ে ঘাটা ঘাঁটি করত। সকাল হবার সাথে সাথেই পাল্‌কী চেপে নদীতে যেত স্নান করতে। নিয়ম বাঁধা জীবন সুরু হল।

একদিন নায়েব গোমস্তাদের ডেকে বলল, আমি দান পত্তর করব।

নায়েব বলল, জো হুকুম।

গোমস্তা বলল, হুজুরের ইচ্ছা।

আনন্দরায় দানপত্র করল।

সব সম্পত্তি লিখে দিল গৃহ দেবতা রাধামাধবেব নামে। হাত জোড় করে অদৃশ্য বিধাতার কাছে মার্জ্জনা চাইল।

একদিন সকালে আনন্দরায় আর অলিন্দ থেকে নামল না। আট কাহারেব পাল্কী রইল দেউড়িতে। দুই স্ত্রী ছুটে এল দোতলার অলিন্দে।

সকালেব আলোতে সবাই দেখল আনন্দরায় দম ধরে বসে রয়েছে। কথা বলছে না। চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। দুই স্ত্রী ধাক্কাধাক্কি করেও কথা বলাতে পাবল না। হতাশ হয়ে ফিবে এসে নিজ নিজ মহলে তারা গজবাতে লাগল।

আনন্দবায় আব কথা বলেনি।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। একদিন শেষ বাতে প্রাসাদের আঙিনায় সশব্দে ভাবী কিছু পড়বার শব্দ পেয়ে পাইক বরকন্দাজ ছুটে এল। তখন আনন্দবায়ের দেহ অসাব হয়ে গেছে। রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নেই।

প্রাসদের চবুতরা থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে আনন্দ রায়।

কেউ কাঁদল, কেউ হাসল, কেউ টিটকাবি দিল। নানা জনে নানা কথা বলল। আনন্দরায় তখন সব কিছুর ঊর্ধে।

২

আনন্দরায়ের মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে নবাব দরবারে পেশ হল। সেই সাথে পেশ হল তার দানপত্রের বয়ান। নবাব কোন হুকুম না দিয়ে সোজা হারেমে এসে গওহরজান বেগমকে ডেকে পাঠাল।

অসময়ে নবাব স্মরণ করেছে জানতে পেরে শঙ্কিত গওহরজান ত্রস্তভাবে এসে কুর্ণিশ জানাল।

আনন্দরায়ের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে নবাব গওহরজানের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নবাবের উৎসুক দৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে গওহরজানের বিলম্ব হল না। এত বড় দুঃসংবাদেও সে মুসড়ে গেল না। নির্বিকার ভাবে নবাবের সামনে বসে রইল।

বিস্মিত ভাবে নবাব প্রশ্ন করল, তুমি কাঁদলে না গওহর?

গওহরজান মৃদু কণ্ঠে বলল, যেদিন কাঁদবার ছিল, সেদিন কাঁদিনি জনাব, আজ কাঁদলে হুজুরে গোস্তাকি হবে।

নবাব ক্ষান্ত হল, প্রশ্ন করল না। আসন ত্যাগ করে উঠতেই গওহরজান আবেদন জানাল। আবেদনের ফয়সালা করতে নবাব ফিরে এসে তক্তে বসল।

কিছু বলতে চাও?

আন্দুরায়ের জমিদারীর ফরমান এই বাঁদীকে দেওয়া হোক।

নবাব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কিসের অভাব?

অভাব! নবাব জিন্দা থাকলে আর নেকনজর যদি বেইস্তেমাল না হয় তা হলে অভাব কোথাও নেই। নসীব যদি বেয়াদপি করে তা হলে হুজুরের বেগমকেও ভিক্ষেয় বের হতে হয়, তাই এই আবেদন।

নবাব খুশী হল। গওহরজানের আবেদন মঞ্জুর হল।

বিকেলের দরবারে হুকুম জারি হল। আনন্দরায়ের বাস্তু বাদ দিয়ে সব সম্পত্তি নবাব সরকারের খাস হল, সেই খাস সম্পত্তির ফরমান দেওয়া হল বেগম গওহরজানের বরাবর।

ইতিহাসের এক অধ্যায় চাপা পড়ল, নতুন অধ্যায় হল আরম্ভ।

গওহরজান নতুন জমিদারী দেখতে বের হবে।

বজরা সাজানো হল। নহবত বাজল।
মালকোষা, শালকোষা প্রস্তুত হল।
নবাবী ফৌজ কুচ্ কাওয়াজ শুরু করল।

যাবার বেলায় নবাব গওহরজানকে ডেকে পাঠাল।

জিজ্ঞাসা করল, আবার ফিরে আসছ তো বেগমসাহেবা ?

হুজুরের হুকুম হলেই আসব।

নবাব স্মিত হাস্যে বলল, তোমার গলার সাতনড়ির একটা ছোট্ট পাথর যদি হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে বেড়াও কি কখনও ?

গওহরজান নবাবের বক্তব্য বুঝতে পেরে নীরবে বেড়িয়ে যাচ্ছিল, নবাব বাধা দিয়ে বলল, শোন বেগম, রাগ কর না। মানুষের জন্ম হয়েছে কাজ করতে, কাজের নেশায় পাগল যে মানুষ তার কাছে বেগম-জহরত আসে-যায়, মনের কোনায় আঁচড় কাটে না।

কিছুক্ষণ থেমে বলল, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম চলবার ফিরবার কিন্তু তোমাকে ভুলে যেতে হবে হারেমের জীবন, ভুলে যেতে হবে মুর্শিদাবাদের মর্যাদা।

ঠিক বুঝলাম না হুজুর।

মুর্শিদাবাদে তুমি ছিলে বেগম, বাইরে যখন যাচ্ছ তখন বেগমের মর্যাদা পেছনে রেখে যেতে হবে, তুমি তোমার এলাকায় শুধু হবে গওহরজান। নইলে নবাবের মর্যাদাহানি হবে।

গওহরজানের নিকট নবাবের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সেও চায় মুক্তি এত সহজে মুক্তি আসতেই সে খুশী হল।

নবাব বলল, অর্থাৎ তুমি হরিশপুরের মালিকানি, বাংলার নবাব গৃহিনী আর নও। আমাদের বিচ্ছেদ ধর্মীয় বিচ্ছেদ এবং চিরকালের বিচ্ছেদ।

গওহরজান নতজানু হয়ে বলল, হুজুরের ইচ্ছা।

হারেমের বেগম বাঁদি যদি রুচির অযোগ্য হয় তাদের বিলিয়ে দেই বাবুর্চি খানসামাদের। প্রয়োজন হলে গুমঘরে কোতল করা হয়। কিন্তু তোমার বেলায় ব্যতিক্রম ঘটল। তোমাকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, সেই ছিনিয়ে আনার দাম দিলাম।

গওহরজান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল।

আরও শোন, নবাবী পরিচালনা যত কঠিন, তার চেয়ে কম কঠিন জমিদারী পরিচালনা নয়। যদি বাঁচবার মত বাঁচতে চাও, নবাবী ফরমানের মর্যাদা রক্ষা করতে চাও তাহলে আমার মতই নির্বিকার ভাবে সব কিছুকে গ্রহন করতে চেষ্টা কর। গওহর যাবে সওহর আসবে, তেমনি নবাব যাবে নাজিম আসবে। বুঝলে! দুনিয়াতে শূণ্য কিছু থাকে না।

গওহরজানের শুভ্র কোমল ওষ্ঠ লজ্জায় রক্তিম হয়ে গেল।

গওহরজান স্বীয় কন্যা মালিকার হাত ধরে বজরায় উঠল।

ভাগীরথীর মোহনা পেরিয়ে পদ্মার উত্তাল তরঙ্গের বুক কেটে বজরা এল নয়নার বুকে। নবাবী ফৌজ তাঁবু বসাল কানাইখালির ঘাটে।

ফরমানের হুকুম শোনান হল।

গওহরজান পত্তনী পেল এগার মৌজার, প্রজারা নজরানা দিয়ে ফিরল। কেউ জিজ্ঞাসা করল না নতুন মালিকানীর পরিচয়, জানতেও চাইল না কোথা থেকে এ জমিদারীর সত্ব এল এই মালিকানীর মুঠোর মধ্যে।

সেলাম জানাল মুন্সী সেলিম খাঁ।

সেলাম দিল মুন্সীর গৃহিনী রহিমা।

সেলিমের সেলাম পেয়ে থমকে গেল গওহরজান। অতি চেনা মনে হল তাকে।

সেলিম খাঁ জবরদস্ত লোক। দেহের বল মনের বলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে। দেখতে দেখতে মুন্সী হল পেশকার, অবশেষে দেখা গেল সেলিম খাঁ নিজেকেই পেশ করেছে গওহরজানের পায়ের তলায়।

নবাব হারেমের পরিত্যক্তা নারীর মর্যাদাহানি যাতে না ঘটে তারই জন্য ভবিষ্যত গড়ে দিয়েছে নবাব স্বয়ং, গওহরজানের ভাগ্যও স্থির করে দিয়েছিল সেই সাথে।

নবাব কোন প্রশ্ন করেনি।

গওহরজানও হারেমের ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু বাদশার যেমন বেগম না থাকা অকল্পনীয়, বেগমেরও বাদশা না থাকা তেমনি বিস্ময়জনক।

অতএব সেলিম খাঁকে বাদশাহের তক্তে বসান কোন আকস্মিক ঘটনা

নয়। সেলিমখাঁর হাত ধরে গওহরজান কানাইখালির কাচারি বাড়িতে ভাল করে সংসার পেতে বসল। সঙ্গে রইল অনুকম্পার পাত্রী সতীন রহিমা আর নিজ কন্যা মালিকা।

গওহরজানের দৌলতে সেলিমখাঁ খেতাব পেল, সম্পদ ভোগ করবার অধিকার পেল, কিন্তু আসল মালিকানা রইল তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ধীরে ধীরে শক্ত-সমর্থ সেলিমখাঁ হারেমে আশ্রয় নিল অক্ষম অনুকম্পার পাত্ররূপে, বেগম গওহরজান নিজের হাতে তুলে নিল সম্পদ পরিচালনার রজ্জু ও দণ্ড। কিছু কালের মধ্যেই সাধারণ লোক সেলিম খাঁর কথা ভুলেই গেল, এমন কি পাইক বরকন্দাজারও কখনও তার মুখ দেখতে পেত না।

সেলিম বুঝল, গওহরজানের রূপ আছে, রূপের উত্তাপ রয়েছে, নেই শুধু ভালবাসবার মত প্রাণ। তার দেহের লিপ্সা রয়েছে, লিপ্সার পরিতৃপ্তি ঘটলে সাহচর্যের প্রয়োজন সে ভুলে যায়। পুরুষকে তার প্রয়োজন, সে প্রয়োজন হৃদয় বৃত্তির লেশমাত্র, পরিচয় থাকে না।

প্রাচীরের আড়ালে সেলিমের বুকের সাথে জাপটে রইল রহিমা। মাঝে মাঝে মালিকাকে কাছে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত! পৌরুষ তার ব্যাহত হত, কিন্তু আয়াসী মনটা ব্যথাকে গোপন করে অসহায়ের মত অক্ষমতাজনিত আত্মতুষ্টি লাভ করত। দায়িত্বপূর্ণ অক্ষমতা গোপন করতে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ত। নিষ্ফল সেই হুঙ্কার কঠিন ইটের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হত, যেখানে আঘাত দেবার সেখানে তার রেশ কণিকা মাত্রও পৌঁছাত না।

মাঝে মাঝে গহওরজান ডেকে পাঠাত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেলিম খাঁ গওহরের হারেমে আসত। সাংসারিক কাজকর্ম সংক্রান্ত আলোচনা হত, তার বেশি নয়।

একদিন গওহরের খাস কামরায় আসতেই বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে গওহর বলল, মালু বড় হয়েছে জানো?

মালিকা যে বয়সে বড় হচ্ছে এর মধ্যে নতুনত্ব কোথাও নেই, সেলিম সে জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। নির্বিকার ভাবে বলল, তাতো দেখছি।

গওহর ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মোটেই দেখছ না। এবার মালুকে লেখা পড়া শেখাতে হয়।

তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।

গওহর কঠিনভাবে বলল, লেখাপড়া না শিখলে এত বড় জমিদারীর হালে পানি পাবে না। তাকে তৈরী করে দিতে হবে ভবিষ্যতের জন্য।

তোমার মেয়ে তুমিই বুঝবে।

তাইতো বুঝছি। তুমি আজ থেকে ফার্সী পড়াও কেননা ও তোমারও মেয়ে। আর একজন পণ্ডিত রেখে দেই সে বাংলা আর সংস্কৃত পড়াবে,. কেন না ওর মায়ের জন্ম হয়েছিল পণ্ডিতের ঘরে।

সেলিম খাঁ হাসল।

হাসছে যে ?

পুরানো কথা মনের কোনে ডেকে এনে কেন অশান্তি ভোগ করতে চাও। বেশ তো আছি। আমি সোমনাথ সেলিমখাঁ হয়েছি, তুমি গৌরী গওহরজান হয়েছ, আর রমা হয়েছে রহিমা। নতুন মানুষ নতুন জীবন।

কিন্তু মালুতো তার পোষাকি নাম নিয়ে বাঁচবে না। তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার পুরাতন আবেষ্ঠনীতে।

তার চেয়ে চল আমরা কাশী যাই। প্রায়শ্চিত্য করে নবতম জীবনের আস্বাদ খুঁজে নেই।

তাতে কোন লাভই হবে না। মাথা মুড়ানোই সার হবে। সমাজ আমাদের নেবে না। অপাংক্তেয় হয়ে রইব সর্বত্র। তার চেয়ে এই ভাল। আমরা আমাদের নিয়েই শেষ হব, পরের জন্য আমাদের কোন দায় দায়িত্ব রাখব না।

সেলিম খাঁ চিন্তিত হয়ে বলল, বামুন পণ্ডিত আসবে কি হারেমে।

আসবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে। আমাদের সদর নায়েব অমরেশকে পড়াতে বল।

কাজটা ভাল হবে কি ?

গৌরী উত্তপ্তভাবে বলল, ভালমন্দ বিচাব করবার সময় বুঝি আজ পেয়েছ। বার বছর আগে ভাবতে পারনি, বিচার করনি কেন ?

ভেবেছিলাম, তোমার বাবার—

মিথ্যে কথা, যে স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না—

সেলিম হাত জোড় করে বলল, আস্তে আস্তে। বাঁদীরা ছুটে আসবে।

গৌরী থেমে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি চাই অমরেশের সাথে মালুর বিয়ে দিতে।

অমরেশ যদি বিবাহে রাজি না হয়। সে যদি ধর্মত্যাগ না করে।

ধর্মত্যাগ কেন করবে, মালু বামুনের মেয়ে বামুনের সাথেই তার বিয়ে দিতে চাই। ধর্মত্যাগ করবার কোন প্রশ্নই নেই। তবে যদি রাজি না হয় সে আলাদা কথা। একথা ভুলে যেও না, গৌরী গওহরজান হয়ে বেঁচে রয়েছে, কেননা বাঁচা তার প্রয়োজন। বাঁচার অধিকার হয়ত তার নেই, কিন্তু প্রয়োজনের চাপে তাকে যখন বাঁচতে হয়েছে, তখন সে তার মেয়েকেও বাঁচিয়ে যাবে।

সেলিম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বসে রইল, গওহরকে কোন যুক্তি দিয়ে সে তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবে এ আশা তার নেই। বেগতিক বুঝেই সে উঠে গেল।

পরদিন সকালে অমরেশের তলব হল হারেমে।

অমরেশ তখন দলিল দস্তাবেজের তলায় ডুবে রয়েছে। নবাবী ফরমানে তেবারিয়া হাটের চৌহদ্দি দেওয়া ছিল না। নয়নপুরের জমিদারদের স্বার্থে হাটের দখল নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। নয়নপুরের জমিদারদের রয়েছে রাজা খেতাব, তাদের ফৌজ রয়েছে, তোপ রয়েছে, অর্থ রয়েছে, সেই কারণেই হাটের দখল নিয়ে হাঙ্গামার অন্ত নেই। অমরেশ খুঁজে মরছে চৌহদ্দি। চৌহদ্দি পেলে নবাব সরকারে নালিশ দায়ের করতে পারে। তিন চার রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে ভোরবেলায় অমরেশ সবে মাত্র ঘুমিয়েছে, এমন সময় তলব এল বড় বেগমের কাছ থেকে।

অনিচ্ছা সত্বেও চোখ ডলতে ডলতে অমরেশ হারেমের দরজায় এসে এত্তালা পাঠাল।

গওহরজানকে অমরেশ সাক্ষাত কখনও দেখেনি। আজ সে পর্দা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াতেই অমরেশ অবাক হয়ে গেল। তার মনে হল, সাক্ষাত দেবী প্রতিমা যেন কালকেতুর কুঁড়েতে উপস্থিত হয়েছেন। অমরেশ হাত তুলে নমস্কার করল।

গওহরজান প্রথম কথা বলল, তোমার সাথে কিছু পারিবারিক কথা আছে।

পারিবারিক! অমর আশ্চর্য হয়ে গেল।

হাঁ। আমি শুনেছি তুমি খুব পণ্ডিত লোক।

ভুল শুনেছেন মা। বামুন-পণ্ডিতের ছেলে কিছু কাজ কারবার চালাবার মত লেখাপড়া শিখেছি।

গওহরজান অমরেশের বিনীত নিবেদন লক্ষ্য না করে বলল, আমার মেয়ে মালিকা সব সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ। আমাদের অবর্তমানে সব দেখাশোনা তাকেই করতে হবে। দেখাশোনা করবার যোগ্যতা যাতে সে অর্জ্জন করে সেই চেষ্টা থাকা উচিত। আমি চাই তুমি অবসর মত প্রত্যহ তাকে পড়াবে।

কিন্তু মা আমার চেয়ে নরেনঠাকুরকে বললেই ভাল হত।

ভাল অনেক কিছুতেই হয়, কিন্তু সবাই তো সমান ভাল বোঝে না। আমার ইচ্ছা তুমি পড়াও।

হুকুম হলে পড়াতে হবে, কিন্তু মা সেরেস্তার কাজ নষ্ট হবে। অনেক জটিল বিষয় এখনও ফয়সালা হয় নি।

দরকার মত আরও দু'চার জন গোমস্তা রাখ, কিন্তু মালুকে পড়াবার ভার রইল তোমার ওপর।

অমরেশ কোন উত্তর দেবার আগেই গওহরজান পর্দা সরিয়ে হারেমের আঙ্গিনায় পা দিল।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বড় বেগমের খাস বাঁদী এসে জানাল মালিকাবেগম বইকেতাব নিয়ে বসেছে। অকল্পনীয় সুযোগ এবং দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে অমরেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় লঘু পদক্ষেপে বাঁদীর প্রদর্শিত পথে হারেমের পাঠগৃহে হাজির হল। তার পৌঁছবার আগেই মালিকা একগাদা পুঁথিপত্তর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। অমরেশ গৃহে প্রবেশ করা মাত্র মালিকা উঠে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

শঙ্কায় অথবা লজ্জায় অমরেশের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। মুখ নীচু করে বলল, বস।

মালিকা বসল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, কি পড়বে?

মালিকা সলজ্জে উত্তর দিল, তা তো জানি না।

অমরেশের প্রশ্ন যে অবান্তর একথা যে কোন পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকই বুঝতে পারত। অনভিজ্ঞ অমরেশ নিজের ত্রুটি অবিলম্বে বুঝতে পেরে বিশেষ লজ্জাজনক অবস্থায় অসহায় ভাবে বলল, আজ পড়াবার মত পুঁথি পত্তর তো আনি নি, কাল থেকে সব নিয়ে আসব।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই অমরেশ বেরিয়ে পড়ল। সেরেস্তায় এসে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। পাঠদান পর্বের প্রথম দিনে একটি কিশোরীর কাছে এমনভাবে অপদস্থ হতে হবে এ কথা কখনও চিন্তা করেনি। হারেমের দরজা পেরিয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল, হাঁপ ছাড়লেও হাঁপানী তাকে ছাড়তে যে পারে না এই সরল সহজ কথাটা বুঝবার ক্ষমতা তার ছিল। সে জানে মালিকানীর আদেশ পালন তার কর্ত্তব্যই নয়, বরং বাধ্যতামূলক। প্রতিদিনই তাকে এই কিশোরীকে পাঠদান করতেই হবে। জীবিকার অন্তরালে এই হল তার উপরি পাওনা।

তবুও নিয়মিত পাঠদান আরম্ভ করতে হল পরদিবস থেকে। হাঁপ ও হাঁপানী ধীরে ধীরে লয় পেয়ে হঠকারিতা প্রশ্রয় পেতে লাগল।

দিনের পর দিন প্রহর গুণে অমরেশ কাব্য পড়ায়, দর্শন পড়ায়, কৌটিল্যের সূত্র পড়ায়। প্রথম প্রথম যত তাড়াতাড়ি সে ফিরতে পারত ততই সে আনন্দ অনুভব করত। কিছুকাল পরে দেখা গেল, অমরেশ সময়ের কোন খেয়াল না রেখে তন্ময় ভাবে পড়িয়ে চলেছে। মালিকাও খাওয়া নাওয়া ভুলে পাঠ গ্রহণ করছে। উভয়েই ক্লান্তিহীন। অমরেশ আর আগের মত সেরেস্তায় বসবার অবসর পায় না। বসলেও পরবর্তী দিবসের পাঠক্রম দেবার সময় কখন আসবে সেই চিন্তাই করতে থাকে।

হঠাৎ একদিন অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, কি শিখলে এতদিনে ?

মালিকা মাথা নীচু করে বেদান্তের কঠিন একটি সূত্রের টিকা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিল। অমরেশের প্রশ্ন শুনে মুখ উঁচু করে বলল, আপনি পাঠ দিয়েছেন পড়তে, শিখতে নয়।

অমরেশ হতভম্বের মত বলল, শেখবার জন্যই তো পড়া।

কৃত্রিম অজ্ঞতা প্রদর্শন করে মালিকা বলল, ও ভুলেই গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, শেখা আর হবেনা পণ্ডিত মশায়।

প্রভু কন্যার বাচন ভঙ্গীতে অমরেশ কৌতুক অনুভব করল। মালিকা কৈশোর অতিক্রম করেছে, তার বক্তব্য অগ্রহণীয় নয়, অথচ বস্তু রূপে তার বক্তব্যকে গ্রহন করা সুযুক্তির পরিচায়ক মনে হয় না। অমরেশ যেন ফাঁপরে পড়ে গেল। এতদিনকার চেষ্টা ও ঐকান্তিকতা যে এক লহমায় ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে একথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বে-মনা হয়ে বোধহয় সে নিজের পরাজয় ও অকৃতিত্বের কথা ভাবছিল। মালিকা বাধা দিয়ে বলল, পড়া ভাল লাগে না।

ক্ষুব্ধ অমরেশ মনের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে বলল, এ কথা তোমার মাকে কেন বলনা ?

মালিকা হাসল।

হাসছ কেন ?

মাকে বলতে ভয় হয়। আপনি-ই মাকে বলুন।

অমরেশ 'বেশ, আমিই বলব' বলে উঠতেই মালিকা বাধা দিয়ে বলল, রাগ করলেন ? একটা মানুষের পক্ষে কতটা শেখা সম্ভব বলতে পারেন ? বেশি শেখা আর না শেখা একই কথা। তার চেয়ে আসুন গল্প করি।

মালিকার কণ্ঠস্বরে কোনরূপ জড়তা নেই। তার সহজ সরল বক্তব্য অমরেশের মনে কঠিন আঘাত করল।

মালিকা জিজ্ঞাসা করল, মুর্শিদাবাদে গেছেন কখনও ?

অমরেশ কেবলমাত্র মাথা নাড়ল।

আপনিই তো মালগুজারি পাঠান।

পাঠাই, নিজে যাইনা। যাওয়া উচিত। তুমি যখন মালিক হবে তখন না হয় মুর্শিদাবাদে আমি নিজে গিয়ে মালগুজারি জমা দিয়ে আসব।

মালিকা হাসল, বলল, আমি মালিক হব, সেই মালিক হবার তালিম দিতেই তো এসেছেন।

তা জানি। মালিকা মালিক হবে সেতো সুখের কথা।

আপনারও ?

আমি তো সবার বাইরে নই। আমার চাওয়া আর না-চাওয়াতে কি এসে যায়, আমার খোস দিল আর অখুশী মন কোনটাই তো পথের কণ্টক নয়। বাদশাহজাদী তক্তে বসলে নফরের কোন অভিযোগ থাকে কি !

নফর !

হাঁ নফর, নায়েব হলেও নফর।

করুণভাবে উত্তর দিয়ে অমরেশ উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটা বুদ্ধি দিতে পারেন পণ্ডিত মশায় ?

অমরেশ কোন কথা না বলে শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি করে না পড়ে দিন কাটান যায়, সেই বুদ্ধিটা যদি দিতেন।

পড়তে কি সত্যি সত্যি ভাল লাগে না ?

না। সব চেয়ে ভাল লাগে গল্প করতে আর গল্প শুনতে।

ভেবে বলব, বলে অমরেশ সেরেস্তায় এসে বসল। মালিকাকে বুঝতে কোথায় যেন তার ভুল হয়ে গেছে। হঠাৎ খাতা-পত্র বুঁজিয়ে এত্তালা পাঠাল বড় বেগমের কাছে।

অনেক দিন পর অমরেশ গওহরজানে সাথে দেখা করতে এসেছে। অমরেশ জানত না গওহরজান অলক্ষ্যে বসে তার কার্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে চলেছে। অমরেশের এত্তালা পেয়ে গওহরজান খুশী হল। সামনে এসেই জিজ্ঞাসা করল, মালুর পড়া শোনা কেমন হচ্ছে অমর ?

সে তো পড়তে চায় না। বলেই অমরেশ মালিকার বক্তব্য এবং বক্তব্যের অনুকুলে তার যুক্তি ব্যক্ত করে উপদেশ এবং আদেশ প্রার্থনা করল।

গওহরজান হাসল। বলল, গল্পের মাঝ দিয়ে শিখিয়ে তুলতে যদি পার তা মন্দ কি। সেই চেষ্টাও করতে পার।

গওহরজান নবাব হারেমে দীর্ঘ বারটি বছর কাটিয়ে এসেছে, তার শাণিত বুদ্ধির অনুপাতে অমরেশ শিশু মাত্র। অমরেশ গওহরজানের কথাগুলোর শব্দার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিল, অন্তরভেদী অর্থ তার বোধগম্য হয় নি। গওহরজানের কথায় সে বরং আশান্বিত হল।

অমরেশ কথান্তরে যাবার প্রত্যাশায় বলল, রাজাদের সাথে হাটের হাঙ্গামা আজও মিটল না।

গওহরজান চিন্তিত ভাবে বলল, আমি মুর্শিদাবাদ না গেলে মিটবেও না। তুমি বরং ফৌজদারের সাথে সাক্ষাত কর, তাকে বুঝিয়ে বল। হাঙ্গামা মেটাবার মতো সাময়িক কোন ব্যবস্থা করতে বল।

অমরেশ উদ্বিগ্নভাবে বলল, নতুন ফৌজদার নাকি কারুর কোন কথা শোনে না।

গওহরজান হাসল। বলল, ফৌজদারকে গোপনে আর ইঙ্গিতে জানিয়ে দিও গওহরজান নবাবের হারেম থেকেই ফরমান নিয়ে এসেছে। যদি না শোনে, আমার হয়ে সেলাম দিও, আমি নিজেই দেখা করব।

অমরেশ ফিরে গিয়েই ফৌজদারকে সেলাম জানাল। বিকেল বেলায় গওহরজানের পাল্কী এসে দাঁড়াল ফৌজদারের সুমারের সামনে। আলম সাহেব নতুন ফৌজদার। অল্প বয়সের সাথে তার রয়েছে প্রচণ্ড দম্ভ। গওহরজানের স্বরূপ জানত না বলেই অমরেশের আর্জি কবুল করে নি। স্বয়ং গওহরজান যখন এসে হাজির হল, তখন শালীনতার খাতিরে আলম পায়ে হেঁটে কাচারির আঙিনায় এসে অভ্যর্থনা জানাল।

দু জনের কি কথা হল জানা যায়নি।

গওহরজান পাল্কীতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে অমরেশকে লক্ষ্য করে বলল, মুর্শিদ-কুলির ফরমানের জোরে গওহরজান জমিদারী পেয়েছে, তার জমিদারীর কোন অংশ বেহাত করবার সাধ্য কারুর নেই। নয়নপুরের রাজারা যা জানে না তাই নিয়েই তাদের দম্ভ। তুমি তুরুক পাঠাও, আর্জি নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাবে।

গওহরজান উর্দুতে আর্জি লেখাল। শেষ স্তবকে সহি করল নিজের হাতে। লিখল, ইয়ে আর্জি লিখনেওয়ালি ম্যয় হুঁ আপকা প্যারি বেগম আরজুমন্দ গওহরজান খান চৌধুরী।

তুরুক সোয়ার জোর কদমে মুর্শিদাবাদ রওনা হল।

পরের দিন পুঁথি পত্তর হাতে না নিয়েই অমরেশ এল পড়াতে।

মালিকা জিজ্ঞাসা করল, পুঁথি পত্তর আনলেন না?

বেগম সাহেবার হুকুম, তোমায় পড়াতে হবে না, তোমার সাথে গল্প করতে হবে।

কিসের গল্প করবেন বলুন।

আমি করব না। তুমি গল্প বলবে, আমি শুনব।

আমি বলব! কিসের গল্প?

তোমরা মুর্শিদাবাদে ছিলে সেই গল্পই বল।

মুর্শিদাবাদ! মালিকা চমকে উঠল।

একদিনে গল্প শেষ হল না। দিনের পর দিন মালিকা গল্প বলে, তন্ময়

হয়ে অমরেশ সেই গল্প শোনে। মাঝে মাঝে মালিকা থামলেই জিজ্ঞাসা করে, তারপর ?

একদিন গল্প শেষ হল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, তোমরা সেই হারেম ছেড়ে এলে কেন ? সেই হারেমের গোলাপ বাগেই তোমাকে মানাত ভাল।

দুর, তাও কি হয়। নবাবের বাঁদী হবার চেয়ে কুঁড়ে ঘরের রাণী হওয়া অনেক ভাল। কাঁটা বনের ঘেঁটু নবাব বাগানের গোলাপের চেয়ে কম মিষ্টি নয়, যদি সে ঘেঁটু নিজের হয়। বলেই মালিকা খিল খিল করে হেসে উঠল।

মালিকার হাসিতে অমরেশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। আবেগের সাথে বলে উঠল, মালু তুমি এত সুন্দর !

লজ্জায় মালিকার গাল রাঙা হয়ে উঠল। সেও ধমক দেবার সুরে বলল, মালু নয় মালবিকা।

বছর না ঘুরতেই রওশন চৌকি বসল, নহবত বাজল। চৌধুরী বাড়ির মালিকানী বেগম গওহরজানের ভাবী উত্তরাধিকারিনী মালিকার বিয়ে। তোপের মুখে বারুদ ঠাসা হয় রোজ বিকেলে, সাঁঝের আঁধারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তোপের আওয়াজ ছোটে। গোলন্দাজ কানে তুলো দিয়ে পাঠশোলার কাঠিতে আগুন দেয়, নয়নার থম থমে জলে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। দুলহা দুলহিনকে কেউ দেখল না। গওহরজান বেগমের খাস কামরায় সোমনাথ মালবিকাকে দান করল অমরেশর হাতে। বেদের মন্ত্র পাঠ করল অমরেশ স্বয়ং। কেউ জানল না, কেউ শুনল না, শুধু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, মালিকার বিয়ে হয়ে গেছে।

বাহিরে যখন হৈ-হাঙ্গামা, চৌধুরীদের হারেমে তখন মালবিকাকে বুকে নিয়ে অমরেশ সোহাগের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, বলতো মালু, কে হারল, কে জিতল ?

দু হাতে অমরেশের মুখ উঁচু করে ধরে মালবিকা বলল, কেউ না। হরিশপুরের আন্দুরায়ের নাত্নির বিয়ে হয়েছে কানাইখালির অমরেশ চক্রবর্তীর সাথে। জিত হলে দুইজনেরই হয়েছে, হার হলেও দুইজনেরই।

কানাইখালির চক্রবর্তী বাড়ির এক নিভৃত কোনে এক বিধবা জননী শুধু

জানত কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেই কাঁদল। তার কাঁদার করুণ বিলাপ চৌধুরী বাড়ির হারেমে আর পৌঁছাল না।

পরের দিন গওহরজান বজরায় মেয়ে জামাইকে পাঠালো হাওয়া বদল করতে।

আগে তোষা, পেছনে তোষা, মাঝখানটায় চৌধুরী বাড়ির বজরা। ফৌজী পাহারায় বজরা এগিয়ে চলল পানসিপাড়ার মোহনার দিকে।

গওহরজানের আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। বার্ধক্য প্রপীড়িত নবাব নতুন ফরমানে তেবারিয়ার হাট গওহরজানকে দান করেছে।

অমরেশ আর মালবিকা আর ফিরে আসেনি। গওহরজান নিজের পরিবেশ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মেয়ের ভবিষ্যতকে নিজের জীবনের কালিমা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে। কন্যাকে চোখের আড়াল করেও সে সুখী।

সেলিম এসে জানাল রহিমাকে নিয়ে সে কাশী বাস করতে চায়।

গওহরজান প্রথমে আপত্তি তুলেছিল, শেষে সম্মতি জানিয়ে বিদায় দিল। সেলিম চেয়ে ছিল গওহর তার সাথেই কাশীতে গিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন কাটায়। গওহরজান রাজি হয়নি। সবাই চলে গেলে গওহরজান কাঁদতে বসল। বিগত পনর বিশ বছর গওহর চোখের জল ফেলেনি, কখন অনুশোচনা জানায়নি। আজ কেনবা না কেঁদে সে পারল না।

মুর্শিদকুলি ফতে হয়েছে।

নতুন নবাব সরফরাজ।

গদীতে বসে হিমসিম খেয়ে অস্থির।

বার্ধক্য এসেছে গওহরজানের দেহে ও মনে। স্বপ্নের মত অতীত জীবনের ভয়ঙ্কর স্মৃতি তার চিন্তাধারায় বিপর্যয় নিয়ে আসে মাঝে মাঝে।

খবর এসেছে সরফরাজের মৃত্যুর।

খবর এসেছে সেলিম খাঁর দেহ রক্ষার।

গওহরজান এই সংবাদ পাবার পর শয্যা গ্রহণ করেছে।

সদর নায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিয়েছে বজরা প্রস্তুত করতে। গওহরজান একাই যাবে কাশীতে।

বজরার ছাদে বিছানা পেতে পালঙ্কে শুয়ে রইল গওহরজান। সেপাই বরকন্দাজের পাহারায় বজরা চলল পদ্মার উজানে।

আবার সেই বজরা। আবার আকাশে চাঁদ উঠেছে।

তিরিশ বছর আগে এমন এক চাঁদিনী রাতে গওহরজান উজানী বজরায় সোয়ারী হতে বাধ্য হয়েছিল।

বীণ বাজছিল, ঘুঙুরের তালে তালে সারেঙ্গী সারেঙ্গের কান মোচড়াচ্ছিল। সুরাসিক্ত ওষ্ঠ অলক্ষ্যে গৌরীর অধরোষ্ঠে আগুন ঢেলে দিয়েছিল সেদিন। নারীত্ব গেল, মাতৃত্ব গেল। অসহায় গৌরী কোন এক অখ্যাত রাতে নয়নার বুকে হারেমের হাজার হাজার নারীর মত নবাবের সাময়িক দেহলিপ্সা শান্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে সবলের উৎপীড়নকে ভবিষ্যতের সৌভাগ্য সৃষ্টির পদক্ষেপ বলে নতমস্তকে গ্রহন করে নিয়েছিল।

সেই নয়নার বুক বেয়ে উজানে বজরা চলেছে তিরিশ বছর পরে। গৌরীর সেই রূপ নেই, যৌবনের জৌলুষ নেই, সেই রূপ যৌবনের ছায়াও বোধ হয় নেই। আজ সে অবসর পেয়েছে ভাববার।

ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, কোনদিন সোমনাথকে সে ভালবেসেছিল কি না, সোমনাথও তাকে ভালবাসত কি না। বুঝতে পারল না সে ঘর চেয়েছিল, না বর চেয়েছিল, বোধহয় দুটোই চেয়েছিল, নয়ত কোনটাই নয়।

পানসিপাড়ার ঘাটে বজরা থামতেই গওহরজান পেশকারকে ডেকে বলল, দেহটা ভাল মনে হচ্ছে না, আজকের মত এখানেই খুঁটি গাড়ি কর।

পেশকার গঞ্জের ঘাটে খবর পাঠাল। কবিরাজ এল, হেকিম এল। সবাই ভ্রূকুঁচকে বলল, বেগমকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

গওহর নিজেই বাধা দিল। সে যাবে না। জড়ি বড়ি দাওয়াই এল। বজরা বাঁধা হল পদ্মার কিনারায়।

সকাল বেলায় ধীরে ধীরে গওহরজান বজরা থেকে নেমে গঙ্গায় স্নান করল। হাত জোড় করে সূর্য প্রণাম করল।

পেশকার মানা করতে গিয়ে ধমক খেল।

গওহরজান রোগাক্রান্ত দেহটা নিয়ে আবার এসে বজরার ছাদে গা এলিয়ে দিল।

শেষ রাতে খাস বাঁদী গিয়ে ডেকে আনল পেশকারকে।

গওহরজান ডাকল, শোন।

পেশকার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি আর বাঁচব না। তাই তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। আমার গোটা জমিদারী দানপত্র করে দিয়েছি তা বোধ হয় জান।

পেশকার বলল, শুনেছি।

তারা যেন খারিজ দাখিল পায়, কেমন?

আজ্ঞে হাঁ।

আমি মরলে আমাকে কানাইখালির ঘাটে কবর দিও।

পেশকার শুধু মাথা নাড়ল, কোন কথা বলল না।

শেষ রাতে আকাশে শুকতারা উঠেছে, পদ্মার বুক বেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ বেয়ে চলেছে। গওহরজান আকাশের দিকে চেয়ে বলল, নারায়ণ।

পেশকার চমকে উঠল।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে গওহরজান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এতদিনকার সাধ আহ্লাদ সাড়ে তিন হাত জমির জন্য বুঝি এতকাল অপেক্ষা করছিল।

বজরা ভাটিতে ভেসে চলল।

কানাইখালির ঘাটে ভূমি শয্যায় শুয়ে রইল গওহরজান। বাংলার নবাবী আমলের অখ্যাত কোন এক নারী সর্বস্ব দিয়ে বিত্ত সংগ্রহ করে দিয়ে গেছে অপরকে। বিত্ত ভোগ করবার অধিকার নিজের হাতেই তুলে দিয়ে গেছে অপরকে। অতৃপ্তির উত্তাপহীন জীবনের ঐ বুঝি ছিল পরিণতি। আজও তার কবরখানায় বংশ পরম্পরায় সাঁঝের চেরাগ জ্বালাচ্ছে ফুলীর মা।

কাশীর গঙ্গার তীরে অমরেশ আর মালবিকা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে। সোমনাথের মৃত্যুর পর রমা আশ্রয় নিয়েছে তাদের কাছে। রমা সংসার সামলায়, অমরেশ বেদপাঠ করে, মালবিকা নিজে সাজে ঘর সাজায়। বছরে একবার করে নতুন সদর নায়েব বিশ্বম্ভর সরকার শালিয়ানা খরচা পৌঁছে দিয়ে যায়।

খবর এল গওহরজানের মৃত্যু হয়েছে।

দানপত্র পাঞ্জার ছাপ বুকে নিয়ে উত্তরাধিকারিনীর কাছে পৌঁছাল।

মালিকা বেগম বিক্রয় কবলা করে সব সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিল অমরেশ চক্রবর্তীর নামে। গওহরজানের অর্জিত সম্পত্তি পেশওয়াজ ছেড়ে

শাড়ি পরিধান করল। মালিকা মালবিকার ঘোমটার তলায় ডুবে গেল। ন্যায়পঞ্চানন অমরেশ চক্রবর্তী এখন খোদ মালিক।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা কি ভাল হল?

মালবিকা হেসে বলেছিল, ঘুণ ধরা বাঁশে তেলরঙ্ মাখিয়ে সঙ্ সাজান যায়, তাতে তার আয়ু বৃদ্ধি পায় না, তার চেয়ে নতুন ইমারতের শক্ত বনিয়াদ তৈরী করলে বেশী কাজে লাগবে।

অমরেশ নতুন ইমারতের পত্তন করল।

আনন্দরায়ের দ্বিতীয় পুরুষের সমাধি রচনা হল।

কিন্তু ইমারতের বনিয়াদ মোটেই শক্ত হয়নি। কোন্ দিক থেকে যে ঝড়ের ঝাপটা এল তা বুঝবার আগেই ইমারত ধসে পড়ল। নিঃসন্তান মালবিকার উত্তর পুরুষ রইল অনন্ত ভাদুড়ির বড় তরফের সন্তান। তাদের এমন কোন দলিল বা প্রামাণ্য কাগজ ছিল না যার দাবী নবাব সরকারে গ্রাহ্য হয়। জমিদারী বারভূতের সম্পদে পরিণত হল।

ইংরেজ এল রাজা হয়ে।

আনন্দরায়ের জমিদারী ইংরেজের কাগজে আর লেখা হল না, গওহরজানের কোন দাবীই স্বীকার করল না। ইংরেজের দয়ায় শুধু চেরাগ জ্বালাবার মত কয়েক বিঘা জমির অধিকার পেল মোতোয়াল্লি।

এত বড় বৈচিত্র্যময় বিরাট কাহিনীর যবনিকা নেমে এল লোকচক্ষুর অন্তরালে। সবাই ধীরে ধীরে ভুলে গেল আসল মানুষটিকে। রইল বেঁচে উপকথা।

তারপরও পৌনে দুই শত বছর কেটে গেছে।

কানাইখালির জমিদার বাড়ির দেউড়ি ভেঙ্গে গেছে, চৌধুরীদের কাচারি বাড়ি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী হয়েছে ইংরেজের আদালত। ঘাটের ধারে গওহরজানের কবর আজও আছে। ইঁটের ঘেরা ভেঙ্গে গেছে। এক টুকরো পাথরে শুধু লেখা রয়েছে গওহরজানের পরিচয়। নদী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে চেনবার উপায় নেই, এই নদীর বুকে বজরা বেয়ে, ভোষা বেয়ে, ছিপ বেয়ে নয়নপুরের গঞ্জে এসে তাঁবু ফেলত অতীতের ভাগ্যবিধাতার দল। বাংলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত নয়নার বুকে একথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না।

আমি আর বাঁচব না। তাই তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। আমার গোটা জমিদারী দানপত্র করে দিয়েছি তা বোধ হয় জান।

পেশকার বলল, শুনেছি।

তারা যেন খারিজ দাখিল পায়, কেমন?

আজ্ঞে হাঁ।

আমি মরলে আমাকে কানাইখালির ঘাটে কবর দিও।

পেশকার শুধু মাথা নাড়ল, কোন কথা বলল না।

শেষ রাতে আকাশে শুকতারা উঠেছে, পদ্মার বুক বেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ বেয়ে চলেছে। গওহরজান আকাশের দিকে চেয়ে বলল, নারায়ণ।

পেশকার চমকে উঠল।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে গওহরজান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এতদিনকার সাধ আহ্লাদ সাড়ে তিন হাত জমির জন্য বুঝি এতকাল অপেক্ষা করছিল।

বজরা ভাটিতে ভেসে চলল।

কানাইখালির ঘাটে ভূমি শয্যায় শুয়ে রইল গওহরজান। বাংলার নবাবী আমলের অখ্যাত কোন এক নারী সর্বস্ব দিয়ে বিত্ত সংগ্রহ করে দিয়ে গেছে অপরকে। বিত্ত ভোগ করবার অধিকার নিজের হাতেই তুলে দিয়ে গেছে অপরকে। অতৃপ্তির উত্তাপহীন জীবনের ঐ বুঝি ছিল পরিণতি। আজও তার কবরখানায় বংশ পরম্পরায় সাঁঝের চেরাগ জ্বালাচ্ছে ফুলীর মা।

কাশীর গঙ্গার তীরে অমরেশ আর মালবিকা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে। সোমনাথের মৃত্যুর পর রমা আশ্রয় নিয়েছে তাদের কাছে। রমা সংসার সামলায়, অমরেশ বেদপাঠ করে, মালবিকা নিজে সাজে ঘর সাজায়। বছরে একবার করে নতুন সদর নায়েব বিশ্বম্ভর সরকার শালিয়ানা খরচা পৌঁছে দিয়ে যায়।

খবর এল গওহরজানের মৃত্যু হয়েছে।

দানপত্র পাঞ্জার ছাপ বুকে নিয়ে উত্তরাধিকারিনীর কাছে পৌঁছাল।

মালিকা বেগম বিক্রয় কবলা করে সব সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিল অমরেশ চক্রবর্তীর নামে। গওহরজানের অর্জিত সম্পত্তি পেশওয়াজ ছেড়ে

শাড়ি পরিধান করল। মালিকা মালবিকার ঘোমটার তলায় ডুবে গেল। ন্যায়পঞ্চানন অমরেশ চক্রবর্তী এখন খোদ মালিক।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা কি ভাল হল?

মালবিকা হেসে বলেছিল, ঘুণ ধরা বাঁশে তেলরঙ্ মাখিয়ে সঙ্ সাজান যায়, তাতে তার আয়ু বৃদ্ধি পায় না, তার চেয়ে নতুন ইমারতের শক্ত বনিয়াদ তৈরী করলে বেশী কাজে লাগবে।

অমরেশ নতুন ইমারতের পত্তন করল।

আনন্দরায়ের দ্বিতীয় পুরুষের সমাধি রচনা হল।

কিন্তু ইমারতের বনিয়াদ মোটেই শক্ত হয়নি। কোন্ দিক থেকে যে ঝড়ের ঝাপটা এল তা বুঝবার আগেই ইমারত ধসে পড়ল। নিঃসন্তান মালবিকার উত্তর পুরুষ রইল অনন্ত ভাদুড়ির বড় তরফের সন্তান। তাদের এমন কোন দলিল বা প্রামাণ্য কাগজ ছিল না যার দাবী নবাব সরকারে গ্রাহ্য হয়। জমিদারী বারভূতের সম্পদে পরিণত হল।

ইংরেজ এল রাজা হয়ে।

আন্দুবায়ের জমিদারী ইংরেজের কাগজে আর লেখা হল না, গওহরজানের কোন দাবীই স্বীকার করল না। ইংরেজের দয়ায় শুধু চেরাগ জ্বালাবার মত কয়েক বিঘা জমির অধিকার পেল মোতোয়াল্লি।

এত বড় বৈচিত্র্যময় বিরাট কাহিনীর যবনিকা নেমে এল লোকচক্ষুর অন্তরালে। সবাই ধীরে ধীরে ভুলে গেল আসল মানুষটিকে। রইল বেঁচে উপকথা।

তারপরও পৌনে দুই শত বছর কেটে গেছে।

কানাইখালির জমিদার বাড়ির দেউড়ি ভেঙ্গে গেছে, চৌধুরীদের কাচারি বাড়ি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী হয়েছে ইংবেজের আদালত। ঘাটের ধারে গওহরজানের কবর আজও আছে। ইটের ঘেরা ভেঙ্গে গেছে। এক টুকরো পাথরে শুধু লেখা রয়েছে গওহরজানের পরিচয়। নদী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে চেনবার উপায় নেই, এই নদীর বুকে বজরা বেয়ে, তোষা বেয়ে, ছিপ বেয়ে নয়নপুরের গঞ্জে এসে তাঁবু ফেলত অতীতের ভাগ্যবিধাতার দল। বাংলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত নয়নার বুকে একথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না।

কানাইখালি নয়নপুরের পশ্চিম সীমানা।

চেরাগি চাকরান নিয়ে ফুলীর মায়ের দশপুরুষ সাঁজের বাতি জ্বালছে গওহরজানের কবরে।

যতীশ এসব কাহিনী শুনেছে।

পিতার পায়ে হাত দিয়ে শপথ করেছিল, আন্দুরায়ের জাঙ্গাল তাকে পেতেই হবে।

জাঙ্গাল সে পেয়েছিল। সত্যমিথ্যা নানা সাক্ষ্য, নানা দলিল দস্তাবেজ পেশ করে যতীশ ডিগ্রী পেল কিন্তু ততদিন আরেকটি ডিগ্রী অলক্ষ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জাঙ্গালের দখল পাবার পর যতীশ হিসাব করে দেখল ঋণের অঙ্ক বয়েক সহস্র, দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, পিতৃদেব গতায়ু হয়েছেন। জাঙ্গাল তাকে কাঙ্গাল করেছে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে মোটেই বিলম্ব ঘটল না।

যতীশ রায় অপরিতৃপ্তি নিয়ে হঠাৎ একদিন চোখ বুঁজল।

রইল দুটি নাবালক পুত্র আর তিনটি অনূঢ়া কন্যা।

তিনশত বৎসরের ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটল। নতুন রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল, দুইটি অসহায় কিশোর ভাগ্যান্বেষে নতুন উৎসাহে ছুটে চলেছে।

৩

যতীশের মৃত্যু রায় পরিবারে নবযুগের সূচনা করল।

জেষ্ঠ নীতীশ প্রবেশিকা পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভিন জেলা থেকে ছুটে এসেছিল। যতটা বেগে এসেছিল তার কণা মাত্র বেগেও ফিরবার সময় রইল না। মায়ের নিকট হিসাব পেয়ে সপ্তদশবর্ষীয় কিশোরের বুঝতে বিলম্ব ঘটল না যে, পাঠ্যজীবন তার শেষ হয়ে গেছে। আশু পারিবারিক সমস্যা সমাধানের আশায় পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পনর টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে বহাল হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। নবজীবনের এই হল সূত্রপাত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় মহত্বের প্রশ্ন রয়েছে, জ্ঞানদানের পূণ্যব্রত রয়েছে, নাই কেবল পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা। তবুও হয়ত সান্ত্বনা থাকত, মাসের শেষে যখন পনরটি মুদ্রাও পকেটস্থ হত না তখন নীতীশের তরুণ মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত।

প্রতিপাল্য জনসংখ্যা কম নয়। পিতৃ পরিত্যক্ত ভূমিতে সম্বৎসরের আহার্য সংগ্রহ হয় না। অতএব চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হল। কৃচ্ছ্রতা দিয়ে নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে না দিয়ে যাতে উপার্জন বৃদ্ধি পায় তারই চিন্তা হল মূখ্য।

দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। অভাবও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মা বলল, নীতু তুই, রাজবাড়িতে যা। দেওয়ানের সাথে দেখা কর। রাজার সেরেস্তায় কোন না কোন কাজ জুটবেই। তাতে মাইনে বাদেও দু পয়সা উপরি আসবে।

নীতীশ শুধু বলল, না।

সংসার চলবে কি করে বলত ?

দেখছি। বলে নীতীশ মায়ের সম্মুখ থেকে পালিয়ে বাঁচল। ভেবে ঠিক করল, মোক্তারি পরীক্ষা দেবে। খুঁজে পেতে কয়েকখানা আইনের বই সংগ্রহ করে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে সে পাঠ সুরু করল।

সকাল বেলায় চাষের তদারক করত। দুপুরে বিদ্যালয়ের কাজ করত।

বিকেলে তরিতরকারির বাগান করত। রাতের বেলায় আইনের বই নিয়ে বসত। অধিক রাত অবধি পড়তে পড়তে কোন কোন দিন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত। ছেলে যতক্ষণ পড়ত সুখদাও জেগে থাকত। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে সুখদা এসে লণ্ঠন নিবিয়ে মাথার তলায় বালিশ দিয়ে নিজে শুতে যেত।

পাশের ঘরে স্মৃতীশ প্রবেশিকা পাশের পড়া তৈরী করে। সেও পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে সুখদা লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে যেত।

কখনও কখনও সুখদা ঘুমিয়ে পড়ত। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে ছুটে যেত ছেলেদের ঘরে। তাদের ডেকে তুলে শোবার ব্যবস্থা করত।

মাতা ও পুত্রদের তপস্যা চলেছে। যতিহীন এই তপস্যা।

অনেক দিন পর মাঝরাতে লণ্ঠনের আলোতে সুখদার চেহারা দেখে নীতীশ চমকে উঠল।

মায়ের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ মা।

সুখদা কোন উত্তর না দিয়ে নীতীশের বালিশেব তলায় দুখানা মোটা বাঁধান বই গুঁজে দিল।

নীতীশ জিজ্ঞাসা করল, তুমি সারাদিন কি ভাব বল দেখি ?

সুখদা উদাসভাবে বলল, ভাবনার কি অন্ত আছে। ভাবি, তোরা কবে বড় হবি।

যদি বড় হবার হয় তা হলে তুমি না ভাবলেও বড় হব, বুঝলে। প্রকৃতির নিয়মে গা-গতরে বড় হয় সবাই। প্রাণ থাকলে দেহের বৃদ্ধি হবেই হবে।

সেই বড় হওয়াই কি সব। মানুষ যোগ্যতা দিয়ে বড় হয়, কীর্ত্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

নীতীশ হাসল, বলল, কীর্ত্তি। তা বটে। আচ্ছা মা, আজ সকালে স্মৃতিকে কোথায় পাঠিয়েছিলে ?

মাজগ্রামে শিরোমণিদের বাড়িতে। তোর বাবা শান্তির বিয়ে একরকম ঠিক করেই রেখেছিল। সে মারা যাওয়াতে আর এগোতে পারিনি। শুনলাম নটবর শিরোমনি তার ছেলে ইন্দুনাথের অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করছে। তাই পাঠিয়েছিলাম। তা বাপু যা খাঁকতি, ও মেটাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। ওরা অন্যত্রই ব্যবস্থা করুক।

এতদিন একথা তো বলনি মা।

বলে কি হবে বল দেখি। এই সংসার তোর মাথায়, তার উপর মেয়ের বিয়ের কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তুই পারবি কেন? আগে দাঁড়িয়ে নে, তারপর যা হয় হবে। আমাদের সময় একান্ন টাকা পণে মেয়ের বিয়ে হত। এখন শুধু দাও আর দাও। আজ আর কুল, বংশমর্যাদা, সুলক্ষণ মানুষ দেখে না, আজ টাকাই কুল, টাকাই মর্যাদা, টাকাই সুলক্ষণ। টাকা নেই তাই বলবার মত কথাও নেই।

বস্তুতান্ত্রিক জগতে অর্থ যে একমাত্র বাঁচার উপাদান সে কথা নীতীশ না বোঝে এমন নয়। তবুও তার মন এই উপাদানের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে চায় না। এ নিয়ে কখনও তর্ক করেনি, যুক্তির জাল মেলে ধরেনি, অথচ মনের সাথে গ্রহনও করতে পারেনি।

সুখদা নিজেই আবার বলল, তুই মোক্তারি পাশটা করলে তোর বিয়ে দেব তারপর দেব শান্তির বিয়ে।

নীতীশ হেসে বলল, অর্থাৎ কিছু উপার্জ্জন করে তা ব্যয় করবে এইতো। কিন্তু অপরের লোভ কখনও মানুষের আদর্শ হতে পারে না। বলতে গেলে এটা হল প্রতিশোধস্পৃহা। শিরোমণির দল হয়ত তা স্বীকার করে না, কিন্তু এরাই সবার অজ্ঞাতে মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে নিম্নগামী করে। একজন সর্বস্বান্ত হলে অপরকে আঘাত দেবার সুযোগ খোঁজে। তুমিও বোধহয় সেই পথেই পা দিয়েছ।

সুখদা হৃদয়হীনতার অভিযোগ স্বীকার করল না, পরোক্ষে মেনে নিল, বলল, অসহায়কে এই ভাবেই পথ খুঁজে নিতে হয়।

মৃদুকণ্ঠে নীতীশ জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি চায়?

ষোল তোলা সোনার গয়না, নগদ পাঁচশ আর যৌতুকাদিতে পাঁচশ।

সুখদার কণ্ঠস্বরে হতাশার ধ্বনি ফুটে উঠল।

নীতীশের নীতি বিদ্যা থ' হয়ে গেল। তবুও সব শক্তি সংগ্রহ করে বলল, বিয়ে দেবার নৈতিক দায়িত্ব যখন আমাদের তখন অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

তা হলে সরকুতিয়ার রায়তি জোত বিক্রি করতে হয়।

নীতীশ আবেগের সাথে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করলেও মায়ের প্রস্তাব

অন্তরের সাথে গ্রহন করতে পারল না, বলল, যে টাকা ব্যয় করে বিয়ে দিতে চাইছ, সেই টাকা দিয়ে ওর পায়ে দাঁড়াবার মত সংস্থান করে দাও। পুরুষকে ক্রয় করেও যদি মেয়েকে বাঁদীগিরি স্বীকার করে নিতে হয় তা হলে সেই ক্রয় মূল্য দিয়ে কি লাভ!

তুই অত বুঝবি না নীতু। মন ঠিক করে নে। যদি বিয়ে দিতেই হয়, তা হলে এই একমাত্র উপায়। বিবাহ বাঁদীগিরি নয়, অসহায়ের অবলম্বন সৃষ্টি করে দেওয়া মাত্র।

অবলম্বন! তা বটে। অত বুঝিনা মা। পয়সা দিয়ে গরু কিনলে তার ওপরও অধিকার থাকে, আর পয়সা দিয়ে কেনা স্বামীর ওপর অবলম্বন বিনা অন্য কোন অধিকার থাকবে না কেন, তা বুঝি না।

তর্ক করে লাভ নেই। এই আমাদের সমাজ, আর এই হল সমাজের বিধান।

যে সমাজের বিধি পালন করতে চরম দারিদ্র এসে তোমাকে উপহাস করবে, সে সমাজকে মেনে নেবার কতটুকু প্রয়োজন আছে তা আমি জানি না। কিন্তু ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তুমি রাস্তায় দাঁড়ালেও সমাজকে খুশী করতে পারবে না। তার উদর গহ্বর পূর্ণ করবার সঙ্গতি আজও মানুষের হয়নি। মনে কর, সরকুতিয়া বিক্রি করে শান্তির বিয়ে হল। তারপর শ্যামলী আর শেফালীর বেলায় কোন কুতিয়া বিক্রি করবে?

ততদিন তোরাও বড় হবি।

বড় হব কি ছোট হব সে কথা ভগবানও বলতে পারে না, কিন্তু সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে হয়। কালকে কালীকাকা আর রাজার মায়ের সাথে কথা বলে দেখব। আজকে তুমি শুতে যাও, অনেক রাত হয়ে গেছে।

সুখদা বিনা বাক্যবয়ে শুতে চলে গেল।

তার মনে হল, সমাধানের পথ অনেকটা সামনে এসে গেছে। বিশেষ করে রাজার মায়ের কথাটা তার মনঃপূত হল।

রাজার মা! নয়নপুরের রাজার মা। কিন্তু রাজার বাবা রাজা নয়। রাজত্বের স্বপ্নও সে কোন দিন দেখেনি। সে স্বপ্ন দেখবার স্পর্দ্ধা হরকান্তের ছিল না। দু চার বিঘে জোতজমা আর যজমানী নিয়েই তার জীবন।

সংসারে দুটি প্রাণী। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী গড়া পড়ে, লাল মোটা চালের ভাত সেদ্ধ করে, শাক চচ্চড়ি রাঁধে, সুখেই ছিল তারা। অথচ দুঃখ দুজনেরই অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে। পরপর তিনটি সন্তান জন্মের পর মারা যাওয়াতে ঘর তাদের শূণ্য। সোনার কার্তিকের মত ছেলে জন্মায়, দু চার মাস হাত পা ছোড়ে, কাঁদে কাটে, তারপরই কি হয়ে যায়, ব্রাহ্মণীর কোল খালি হয়। বহু মানত-মানসিক কবচ-তাবিজ করেও তিন তিনটে তাজা ছেলে গতায়ু হতেই হরকান্ত কেমন যেন.উদাস হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণী আসন্ন প্রসবা। চতুর্থ সন্তান তার গর্ভে। এবারও সোনার চাঁদ ছেলে এল কোলে। হাড়ি বউ হরকান্তকে খবর দিল। খবর শুনে হরকান্ত নড়ল না, কোন কথাও বলল না। যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবে বসে রইল।

হাড়ি বউ মরুনচে মায়ের ছেলেকে এক কাঠা খুদ দিয়ে কিনে নিল। ব্রাহ্মণের সন্তান বাঁচে না, হাড়ি মায়ের সন্তান যদি বাঁচে এই শুধু আশা। ছেলের নাম দেওয়া হল খুদু।

একদিন অতি প্রত্যুষে নয়নপুরের রাজার কুলপুরোহিত এসে অধিষ্ঠান হল হরকান্তের পর্ণকুটিরে।

মহারাণীর আজ্ঞায় তোমার কাছে এলাম রায়মশায়।

হরকান্ত আপ্যায়িত হয়ে হাত জোড় করে মহারাণীর আজ্ঞা শুনবার প্রতীক্ষায় রইল।

জান তো মহারাজা ব্রজনাথ নিঃসন্তান মারা গেছেন।

আজ্ঞে হাঁ।

তিনি উইল করে গেছেন, মহারাণীকে দত্তক নেবার অধিকার দিয়ে গেছেন।

হরকান্ত বিব্রত ভাবে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

তাই ভিক্ষায় বেরিয়েছি।

একটু থেমে বলল, হাঁ, ভিক্ষা বই কি। রাজবাটির উত্তরাধিকারী ভিক্ষা করতে এসেছি, আর সে ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।

আমার কাছে। হরকান্ত বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তোমার পুত্র রাজলক্ষণযুক্ত। এ সংবাদ মহারাণী পেয়েছেন, তাই আমি তোমার সেই সন্তান ভিক্ষা করছি। নয়নপুরের রাজত্ব তার।

হরকান্ত জবাব খুঁজে পেল না। অনেকক্ষণ বিস্মিত ও হতবাক হয়ে

থাকবার পর সম্বিত ফিরে পেল, বলল, ব্রাহ্মণীকে একবার জিজ্ঞেস না করে কিছুই বলতে পারছি না। আমার ইচ্ছা তো সব নয়। আমার জ্ঞাতি স্বজনও রয়েছে, বিশেষ করে সতীশকাকাকে না জিজ্ঞেস করে কিছুই করতে পারব না।

হরকান্ত গৃহিনীকে সব বুঝিয়ে বলল। কুল পুরোহিতও তার বক্তব্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলল। সন্তানের মঙ্গল এবং সৌভাগ্য কামনা করে না এমন মা পৃথিবীতে ক জন আছে, বিশেষ করে মৃতবৎসা মায়ের পক্ষে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবার এই একমাত্র পথ। অতএব দত্তক দান বিধেয়।

দু চারটি শাস্ত্রবাক্য, রামায়ন মহাভারতের কথা, পুরাণ গীতার শ্লোক শুনিয়ে সেদিনকার মত কুলপুরোহিত বিদায় নিলেন।

হরকান্ত ছুটল সতীশের কাছে। হরকান্তের পিতা এবং সতীশ নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা অতএব তার মত না নিয়ে রায়বাড়ির সন্তানকে দত্তক দেওয়া উচিত কিনা একথা হরকান্ত বারবার ভেবেছে। বংশ মর্যাদার প্রশ্ন রয়েছে।

অনেক যুক্তি পরামর্শ করে অবশেষে দত্তক দেওয়া স্থির হল। কিন্তু ব্রাহ্মণী রাজি হলেন না।

কুলপুরোহিত তূণ থেকে শেষ শর নিক্ষেপ করল। ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্য করে বলল, বউঠান, এরজন্য মহারাণী নগদ পাঁচ হাজার দিতেও রাজি।

ব্রাহ্মণী গর্জে উঠলেন। কি সন্তান বিক্রয়! চিৎকার করে উঠলেন, বললেন, পয়সা দিয়ে ভৃত্য পাওয়া যায় সন্তান পাওয়া যায় না। সন্তান পেটে ধরতে হয়।

আঘাত কোথায় কুল পুরোহিত বুঝলেন এবং বেগতিক দেখে পলায়ন করলেন। সালঙ্কারে সকল সংবাদ পরিবেশন করে মহারাণীর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

মহারাণী বললেন, ঠাকুর তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক। চাল কলা বাঁধা বিদ্যা নিয়ে রাজ্য চালনা করা যায় না, বুঝলে। ভিক্ষা চাইলে যা পাওয়া যায়, মূল্য দিয়ে তা পাওয়া যায় না। যাও, তোমার পুঁথিপত্তর সামলাও, দিন ক্ষণ দেখ, আমি এর বিহিত করছি।

আঠারজন বরকন্দাজ নিয়ে আর ষোল কাহারের পাল্কী চেপে মহারাণী আনন্দময়ী সশরীরে হরকান্তের কুটিরে হাজির হলেন।

সোজা ব্রাহ্মণীর সামনে গিয়ে ডাকল, রাজার মা।

মাথার ঘোমটা নাক বরাবর টেনে দিয়ে ব্রাহ্মণী ফিস্ ফিস করে বলল, কে রাজার মা ?

তুমি। আমি নয়নপুরের মহারাণী, কিন্তু রাজার মা নই। নয়নপুরের রাজা জন্মেছে তোমার ঘরে। তুমি রাজার মা। এস তোমার রাজাকে তার রাজ্য দেখিয়ে আনবে। তুমিই গরবিনী, আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

ব্রাহ্মণী সন্তান সহ রাজবাটিতে গেলেন।

তারপর কি হল জানা যায় নি। যাগ যজ্ঞ হোম হল। নানা দেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এল, দশ মাস বয়সের রাজাকে সোনার টোপর পরিয়ে নিজের কোলে টেনে নিলেন মহারাণী, ব্রাহ্মণীর কোল চিরাচরিত ভাবে আবার শূন্য হল।

দেউড়িতে সাতবার তোপধ্বনি হল। পরিখার ধার দিয়ে সার বেঁধে কাঙ্গালী বসল বিদায়ী নিতে। উৎসবের হুল্লোরে ব্রাহ্মণীকে সবাই ভুলে গেল।

ফিরে এলো রাজার মা শূন্য হাতে।

তার তপ্ত অশ্রু নয়নার জলে ধুয়ে গেছে অনেক কাল আগে। হরকান্ত আর নেই, বার্ধক্যভার প্রপীড়িত রাজার মা আজও বেঁচে আছে। আপদে বিপদে রাজার মা প্রতিবেশীর সম্বল।

নীতীশ যখন রাজার মায়ের কথা বলল তখন সুখদা উৎসাহিত হল। কিন্তু আর্থিক দৈন্যকে অপরের চোখের সামনে তুলে ধরতে মন তার চাইছিল না, সেই কারণেই বোধহয় রাতের শেষ কয়েক প্রহর এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে সকাল বেলায় সূর্য না উঠতেই কলসী নিয়ে পুকুরের জল আনতে গেল।

গৃহস্থালী কাজকর্ম শেষ করে সুখদা রাজার মায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। আজ অবধি সতীশ রায়ের বাড়ি থেকে কেউ-ই রাজার মায়ের ক ছে কোন

আবেদন নিয়ে আসেনি। সেই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিনা ভূমিকায় রাজার মা জিজ্ঞাসা করল, কি মনে করে ছোট বউ ?

শান্তির বিয়ে দিতে চাই বড়দি, ছেলেরাই বলতে আসবে, আমি আগ্ বাড়িয়ে জানিয়ে গেলাম। তুমি হলে বাড়ির বড় বউ, তোমার অনুমতি প্রয়োজন।

রাজার মা নির্লিপ্তভাবে বলল, বেশ তো। কোথায় বিয়ে ঠিক করলে ?

মাজগাঁয়ে। বিয়ের কথা হয়েছে, এখনও পাকাপাকি হয়নি। খাঁই তাদের বেশি তাই ভরসা পাচ্ছিনা।

ছেলে কি করে ?

রেলে চাকরি পেয়েছে।

রাজার মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুখদার আর্থিক অবস্থা জেনে নিল। সুখদা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কন্যার বিবাহের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে কোন কথাই গোপন করল না।

রাজার মা মন্তব্য করল, তোমার মেয়ে আমার মেয়ে একই কথা। এক বাড়িরই বউ আমরা। দশ রাত্তিরের জ্ঞাতি তো। দেখি কি করা যায়। পরশু খুড়ুর সাথে দেখা করতে যাব, সে যদি কিছু করে তা হলে ব্যবস্থা একটা হবে।

সুখদা ফিরে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বলল শোন বউ, একটা কাজ কর। ঐ আন্দুরায়ের ভিটেটা বিক্রি করে দাও। ছোট ঠাকুরপোকে তখনি বলেছিলাম, আন্দুরায়ের ভিটে কারও সয় না, তাতো তোমরা শুনলে না। খুড়শ্বশুরের আদেশ, তাই ঠাকুরপো উঠে পড়ে লেগেছিল আন্দুরায়ের জাঙ্গাল ফিরে পেতে। আমার শ্বশুর বলতেন, ঐ জাঙ্গাল কারুর সয় না। আন্দুরায়ের সয় নি, তার বংশধরদেরও সয়নি। ঐ অপয়া ভিটা বিক্রি করে দাও বউ।

বিয়ের হাঙ্গামটা না মিটলে কিছুই করতে পারছিনা। ছেলেরা নাবালক, সেও একটা সমস্যা।

যথা সময়ে রাজার মা কোলকাতা থেকে ফিরে এসে সুখদার হাতে পাঁচশত টাকা দিয়ে বলল, এবার শান্তির বিয়ের বন্দোবস্ত কর।

সুখদা উঠে পড়ে লাগল।

বিয়েও হল। নির্বিঘ্নে সকল কাজই সমাধা হল।

সরকুতিয়ার রায়তি জোত হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। খাসচাষের কয়েক বিঘা জমি আর বাস্তু ভিন্ন সতীশ রায়ের বংশধরদের আর কিছুই রইল না।

স্মৃতীশ সেই বারেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষা শেষ হলে ঘুরে ফিরে বেড়াবার স্পৃহা সকলের মনেই জাগে। স্মৃতীশও মনে করত এই অবসরে নিকটবর্তী কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসবে, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা তার প্রতিবন্ধক। মনের ক্ষোভ গোপন করতেই সকাল বেলায় সে বেরিয়ে পড়ত নয়নপুরের পথে। সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের সাথে হৈ-চৈ করে ফিরে আসত অনেক রাতে। সুখদা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত। স্মৃতীশ নানা ভাবে মাকে প্রবোধ দিত। আবার সকাল হলেই রওনা হত শহরের পথে।

অবশেষে সুখদা নীতীশের কাছে অনুযোগ ও অভিযোগ উত্থাপন করল।

রাতের বেলায় স্মৃতীশ ফিরে আসতেই নীতীশ ডেকে পাঠাল।

কিছু বলবে নাকি দাদা ?

এত রাত হয় কেন তাই জিজ্ঞেস করছি।

স্মৃতীশ হেসে বলল, কাজ কর্ম নেই, সহচরও কেউ গ্রামে নেই, সময় কাটে কি করে বলত। বন্ধুবান্ধব সহপাঠী যারা রয়েছে তাদের সাথে গল্প গুজব খেলা ধূলা করে দিন কাটাই।

তাতো বুঝি, কিন্তু তুই ফিরতে দেরী করলে মা যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে ওঠে।

মায়েরা অমনি ধারাই হয়। ছেলে বড় হলেও তাকে শিশু মনে করে।

আমাকেও দেখিস কেমন ধমক দেয়, তা বাপু তুই যদি রাত করিস মা এসে আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে। আমারও পরীক্ষা এসে গেছে। পড়া শোনার অসুবিধা হয়। তারচেয়ে তুই একটু তাড়াতাড়ি আসিস ভাই।

বাড়িতে চুপ করে থাকতে ভাল লাগে না, একটা কাজ তো চাই।

একটা কাজ করতে পারবি ?

লঙ্কার সেতু বাঁধতে না হলে সব পারব।

আন্দুরায়ের ভিটেটা পড়ে রয়েছে, ওটা সাফ করে কিছু কিছু তরিতরকারির ব্যবস্থা কর দেখি।

স্মৃতীশ লাফ দিয়ে উঠল, দি আইডিয়া। বাবা আন্দুরায়ের পঁচিশ বিঘে জমি উদ্ধার করতে প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে গেছেন। আমি তার সুযোগ্য পুত্র, এই জমি উন্নয়ন করতে বাকীটুকু খোয়াতে রাজি।

স্মৃতীশের বক্তব্য বাহ্যতঃ ব্যঙ্গ হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ কত যে রূঢ় তা নীতীশ জানে। স্মৃতীশের উচ্ছ্বাসে সে ভীত হল। বলল, জানিস তো আন্দুরায় আমাদের পিতৃকুলের একজন অংশীদার ছিলেন। তার সম্পত্তিতে আমাদের বংশগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তারজন্য ভাগ্যকে উপহাস করে লাভ নেই। ভাগ্য ভাবনার পরিপন্থী হতেও পারে। বরং যা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার কর।

বেশ তাই হবে।

পরদিন কাটারি কোদাল কুড়াল নিয়ে স্মৃতীশ একাই নেমে পড়ল ভূমি উন্নয়নে। হিসাব মত সেদিন থেকে তিরিশ বছর আগে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে যতীশও নেমেছিল ঐ জাঙ্গালের জঙ্গল পরিষ্কার করতে। সেই মহত প্রেরণার সম্মুখে জগলা এসে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ালে রায় বাড়ির ইতিহাস কি ভাবে লেখা হত তা কল্পনার বস্তু। তবুও একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, যতীশ রায়ের উত্তর পুরুষকে নিশ্চয়ই অভাবের তাড়না সহ্য করতে হত না। স্মৃতীশ পিতার এই নিষ্ঠুর পরিণতির কথা জানত, তাই আজ যখন জাঙ্গাল পরিষ্কার করতে নিজের হাতে কোদাল মারতে হল, তখন আত্মবিশ্বাস তার প্রবল হয়ে দেখা দিল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর দড়ি দিয়ে মেপে দেখল, কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে। অনুমানে বুঝল এই রেটে কাজ করতে পারলে আগামী তিন মাসের মধ্যেই মোটামুটি আন্দুরায়ের জাঙ্গাল পরিষ্কার করা সম্ভব হবে।

একমাস কাজ করবার পর কালবৈশাখীর তাণ্ডব সুরু হল। জঙ্গল কেটে সামনে এগোতে এগোতে ধীরে ধীরে পেছনে আগাছা মাথা চাড়া দিতে লাগল।

বিঘে তিনেক জমি পরিষ্কার করবার পর চাপচাপ মাটি কেটে আগাছার গোড়া উপড়ে দিয়ে আগুন জেলে দিল। তিনবিঘে জমি ব্যবহারযোগ্য করতে হলে বাকী জমির দিকে যে নজর দেবার সুযোগ একাকী সৃষ্টি করতে পারবে না একথা স্মৃতীশ উপলব্ধি করল।

নীতীশ মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। স্মৃতীশের সাফল্য তাকেও উৎসাহিত

করে। তিন বিঘেতে তরিতরকারির চাষ আরম্ভ করল নীতীশ। স্মৃতীশ বিশ্রাম পেল, এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে লাগল।

নীতীশ স্মৃতীশকে ডেকে বলল। এ বছর তিন বিঘের মত চাষ হয়েছে, আবার আসছে বছর দেখা যাবে। আর এগিয়ে কাজ নেই।

স্মৃতীশ থামতে চায় না। কিন্তু আগাছা কাটা আর মাটি কোপান এক-কাজ নয়, কাজের ফলাফল ও অগ্রগতি এক নয়। হাতে কলমে চাষ শেখার প্রথম পর্ব শেষ করতে এখনও অনেক বাকী। এমন সময় খবর এল স্মৃতীশ প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

কোদাল হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে স্মৃতীশ এসে গড় হয়ে মাকে প্রণাম করে বলল, আমি পাশ করেছি।

নীতীশ পেছন পেছন এসে বলল, প্রথম বিভাগে। এর আগে আমাদের বাড়িতে প্রথম বিভাগে কেউ পাশ করেনি। আমিও নয়, বাবাও নয়। বুঝলে।

সুখদা সুখী হল। মুখে কিছু বলল না।

রাতের বেলায় চুপি চুপি নীতীশকে ডেকে বলল, স্মৃতীশকেও তোদের স্কুলে ঢুকিয়ে নে বাবা। তাওতো পনরটা টাকা পাবে।

নীতিশ চুপকরে রইল কোন উত্তর দিল না।

কথা বলছিস না কেন?

ওকে এখন কোন কাজ করতে দেব না। আরও পড়ুক।

পড়াতে হলে টাকার দরকার।

তা জানি। তুমি ঘুমোও, কাল সকালে আমি দেখি কি করতে পারি। জান মা, আমি আর যদি তিনটে বছর পড়তে পেতাম তা হলে কি আজ তোমার এত দুঃখ থাকত। বাবার মৃত্যু শুধু যদি তার প্রয়ানেই শেষ হত তা হলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তার মৃত্যু আমাদের সমগ্র পরিবারের বনিয়াদ ধসিয়ে দিয়েছে। নইলে রায়বাড়ির ছেলেরা ঠিকই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত।

সুখদা নীতীশের দুঃখ কোথায় তা জানে। তাই কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে ফিরে গেল।

সকাল বেলায় নীতিশ হাজির হল রাজার মায়ের বাড়িতে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, বড়মা, শীতু এবার পাশ করেছে।

রাজার মা খুশী হল কিনা বোঝা গেল না।

নীতীশ বলল, শীতুকে পড়াতে চাই বড়মা।

বেশ তো। পড়াস তো পড়া।

পড়ানো বললেই তো পড়ান হয় না। তুমি যদি একটু দয়া কর তা হলে পড়াতে পারি।

আমার আবার দয়া, বলে বৃদ্ধা পরবর্তী আবেদনের আশায় চেয়ে রইল।

মাইনে পত্তর না হয় জুটিয়ে দেব, শুধু দু বেলা দু মুঠো ভাত যদি সংগ্রহ হত। রাজবাড়িতে যদি এই ব্যবস্থা করে দিতে।

রাজার মা প্রথমে আবেদন রক্ষায় অক্ষমতা জানিয়ে নীতীশকে বিদায় করলেও অবশেষে সুখদা এসে যখন ধর্না দিল তখন তিনি মহারাজার নামে পত্র লিখে সুখদার হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন, যদি ব্যবস্থা না হয় তাহলে আমাকে দুসোনা ছোট বউ। খুদু বড় ভাল ছেলে, কিন্তু সেতো আমার আর কেউ নয়।

দিনক্ষণ দেখে স্মৃতীশকে রওনা করে দিল কোলকাতার পথে।

স্মৃতীশের পথপানে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুখদা। নীতীশ এসে না ডাকলে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকত কে জানে!

যাবার সময় স্মৃতীশ বলে গেছে, দাদা তোমার কাজ রইল সংসার দেখা, আমার কাজ হোল নিজেকে চালিয়ে নেওয়া। দুজনে দুজনের কাজ করে চলব। তা হলে আর কষ্ট রইবে না।

মাকে বলল, তোমার দুঃখ আমি ঘোচাব। আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সাফল্যলাভ করি।

সুখদা কাঁদেনি। সন্তানের অমঙ্গলের আশঙ্কায় চোখ মুছতে সাহসও পায়নি। একখানা সতরঞ্চ আর একখানা নিজের হাতে তৈরী কাঁথা জড়িয়ে দিয়েছে স্মৃতীশের সাথে। তারই সাথে জড়িয়ে রয়েছে মাতৃ স্নেহের আলপনা।

স্মৃতীশ চলে যাবার পর সুখদার চোখ ভেঙ্গে জল নামল। নীতিশ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মাকে কাঁদতে দেখে ধীর কণ্ঠে বলল, মা তুমি কাঁদছ?

ওরে নারে, বলে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ম্লান হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, তোদের মায়ের যে কাঁদা নিষেধ। আমার চোখের জলে তোদের চলার পথ পেছল হবে, তোরা আছাড় খাবি। মায়ের যে কাঁদতে নেই।

নীতীশও একদিন পড়তে গিয়েছিল। সেদিন যতীশ ছিল, আশা ছিল, ভরসা ছিল, আকাঙ্খা ছিল। আজ শুধু রয়েছে ভিক্ষা পাত্র। সুখদা ভাবছিল, আজ যদি নীতীশের বাবা বেঁচে থাকত! আজই বোধহয় সে নিজেকে সবচেয়ে বেশি অসহায় মনে করছিল। এমন নিঃসঙ্গতা বোধহয় তার জীবনে কখনও অনুভব করেনি। স্বতীশের পথের দিকে চেয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৪

বাস্তব জীবনের সংঘাত শুরু হয় যদি স্বীয় পরিবেষ্টনীর বাইরে মানুষকে আসতে হয়। রূঢ় চেতনার মাঝ দিয়ে তখনই আত্ম-উপলব্ধি ঘটে। নিজের অসহায় অবস্থাকে বুঝতে পারলে রুচি ও ঐতিহ্য সম্পন্ন মন অজ্ঞাতে বিদ্রোহ করে। স্বতীশের মনে এই বিদ্রোহের বীজ রোপিত হল কোলকাতায় পা দিয়ে। হরিশপুর আর নয়নপুর সারা পৃথিবীর মানচিত্রে একটি বিন্দু মাত্র, একথা স্বতীশ কোলকাতার জমিতে পা দেবার সাথে সাথে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করল। যে উৎসাহ নিয়ে স্বতীশ কোলকাতায় এসেছিল সে উৎসাহের রেশ সর্বপ্রথম প্রশমিত হল নয়নপুরের মহারাজার বাড়ির দেউড়িতে।

আসবার সময় সুখদা ক্ষারে কাপড় ধুয়ে দিয়েছিল, সেই কাপড় পরনে, গায়ে জীর্ণাতিজীর্ণ ক্ষারে কাচা হাফ সার্ট, নগ্নপদ, বগলে সতরঞ্চ আর কাঁথার পোঁটলা এহেন বেশভূষায় ভূষিত হয়ে যখন দেউড়িতে পোঁছাল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। দেউড়ি পেরিয়ে কেবল মাত্র আঙ্গিনায় পা দিয়েছে এমন সময় কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, রুখ যাও।

'রুখ যাও' তার কাছে অর্থহীন, কিন্তু কণ্ঠস্বর অর্থহীন নয়। বুঝল প্রবেশ পথ তার জন্য উন্মুক্ত নয়, পথ উন্মোচনে অনেক কাঠ খড় পুড়বে।

ভোজপুরী দারোয়ান আবার জিজ্ঞাসা করল, কেয়া মাংতা?

স্বতীশ কিছু না বুঝেই বলল, আমি মহারাজার দেশের লোক, তাঁর সাথে দেখা করব।

আবি টেইম নেহি। ভিখ্ নেহি মিলেগা।

দারোয়ানের ভাষা স্বতীশের পক্ষে অবোধ্য। নইলে তার মজবুত পেশী কি কাণ্ড ঘটাতো তা বলা যায়না। সে শুধু বুঝল রাজদর্শনে বিঘ্ন অনেক।

রাজার মায়ের চিঠিখানা বের করে দারোয়ানের সামনে ধরে বিনীতভাবে বলল, মহারাজার মায়ের চিঠি, মহারাজাকে দিতে এসেছি।

দারোয়ান চিঠিখানা হাতে নিয়ে বলল, হাম দে দেগা।

চিঠিখানা পকেটে নিয়ে সে বসে রইল।

তার হাবভাব সুবিধার নয় বুঝে স্বতীশ বলল, আমি চিঠির জবাব নিয়ে যেতে এসেছি, এখুনি ওটা পৌঁছে দিতে হবে।

দারোয়ান গোঁফে চুমরি দিয়ে বলল, টেইম নেহি।

স্বতীশ বুঝল এই অসহায় অবস্থা অতিক্রম করতে হলে, হয় আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। নয় আরও এক আধবার অনুরোধ জানিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হবে। অন্তত শেষ চেষ্টা করবার মত বলল, দেখ বাপু এ হল মহারাজার মায়ের চিঠি। তিনি যদি সময় মত না পান তোমারই বিপদ হবে।

পরের বিপদের চেয়ে নিজের বিপদ সম্বন্ধে এ জাতিয় লোকের জ্ঞান বেশি থাকে। এতক্ষণে বিপদের কথায় দারোয়ানের হুঁস হল। বলল, বৈঠো, হাম আতা হ্যায়।

দারোয়ান চলে যেতেই স্বতীশ ধীরে ধীরে দেউড়ী পেরিয়ে বাগানে এসে দাঁড়াল। উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে সে বড় হয়েছে, ঝোপে জঙ্গলে কত ফুলের গাছ দেখেছে, বন্য আবেষ্টনীতে নানা জাতের পাখির কলরব শুনেছে, কিন্তু এমন সাজানো কেয়ারী তার চোখে কখনও পড়েনি। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল মানুষের হাতে তৈরা বনের সৌন্দর্যের নবরূপায়ন।

দারোয়ান দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, মহারাজ বোলাতা হ্যার।

স্বতীশ তার কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দারোয়ান ধমকে উঠল, বলল, কিয়া দেখ্‌তা হ্যায়, আও।

স্বতীশ দারোয়ানের পেছন পেছন গাড়িবারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল। বিছানার পোটলা এককোনায় রেখে পর্দার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে কে যেন বলল, ভেতরে এস।

স্বতীশ কুন্ঠিতভাবে পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল।

বিরাট গালিচার মাঝখানটায় প্রকাণ্ড টেবিল। সারি সারি সোফা সাজান। সোফায় বসে রয়েছে চার পাঁচজন সুবেশধারী। প্রায় একই ধরনের পোষাক সবার। চেহারার পার্থক্য থাকলেও সজ্জার বিশেষ কোন তফাৎ তার চোখে পড়ল না। রাজার মাথায় মুকুট থাকে রূপকথায়, বাস্তবের রাজা চেনবার মত মুকুট থাকে না; রাজদণ্ড রাজার রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে একথা সে জানত। বিশেষ কোন নিদর্শণে যে রাজাকে চেনা যায় সে বিদ্যা তার নেই। হতভম্বের মত চেয়ে রইল।

ফিরে তাকাল। চারিদিকে বড় বড় আয়না। সোফায় উপবেশনকারী সবার চেহারাই আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে। নতুনত্ব অথবা বিশেষত্ব না খুঁজে পেয়ে তার কথা বলবার মত শক্তি লোপ পেল। একবার মনে হল, ফিরে গেলেই ভাল হত। অথচ পা যেন অসার হয়ে আসছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মহারাজা বললেন, তুমি হরিশপুর থেকে আসছ ?

স্মৃতীশ মুখ তুলে তাকাল। গৌরবর্ণ প্রৌঢ়, বিশেষত্ব বিহীন বেশভূষা, এ কণ্ঠস্বর তারই। এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

পড়াশোনা করতে এসেছ। এখানে সুবিধে হবে কি ? কলেজ অনেক দূরে, জানতো, রাজার বাড়ি বারোয়ারী বাড়ি। সময়মত হয়ত খেতেও পাবেনা।

স্মৃতীশ বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। মা তাকে অনুনয় বিনয় জানাবার নানা পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও একটিও তার মনে পড়ল না। অন্যের অনুকম্পা প্রার্থী হয়ে যারা আসে, তাদের বক্তব্যের ভাষা যাই হোকনা কেন, মূল বিষয় বস্তুর কোন তারতম্য কোন সময় থাকে না। তার ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ করবার দায়িত্ব রাজা বাদশা কারুর নয়, অনুকম্পা মাত্র প্রার্থনার বস্তু। হয়ত কিছু বলবার ছিল, কিন্তু পরিবেশ তাকে এত বেশি বিব্রত করে তুলেছে যে, বক্তব্য আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

মহারাজা ডাকলেন, রতিকান্ত।

পর্দার বাহির থেকে আওয়াজ এল, হুজুর।

এই ছেলেটাকে নিয়ে যা, বাগানের শেষ দিকের ঘরখানা খুলে দে। ওখানে থাকবে। আর শ্যামবাড়ির নায়েবকে বলে আয় সেখানে দুবেলা প্রসাদ পাবে।

হাঁ হুজুর, বলে রতিকান্ত স্মৃতীশকে অনুগমন করতে ইঙ্গিত করল।

স্মৃতীশ আবার প্রণাম করে রওনা হতেই বলল, শোন, কিছু অসুবিধা হলে দেবসেবার নায়েবকে বলবে, বুঝলে। আর অসুবিধা বাদ দিয়ে তো সুবিধা সৃষ্টি হয়না, শুধু একটু ম্যানেজ করে নিও। কেমন ?

স্মৃতীশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রতিকান্তের পেছন পেছন রওনা হল।

বাগানের শেষ কোনায় একসময় রাজবাড়ির আস্তাবল ছিল। তখন রাজার তিন চারখানা ক্রহাম ছিল, ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল বেশি। কোচোয়ান আর সহিস ছিল ডজনখানেক। যন্ত্রযুগে ক্রহাম গাড়ি অচল হয়ে গেছে। তার

স্থান নিয়েছে মোটরগাড়ি। আস্তাবলের ঘোড়া বিদায় নিয়েছে। ক্রহাম গাড়ি পুরাতন আসবাবের দোকানে বিক্রি হয়ে গেছে। সহিস কোচোয়ানদের ঘর খালি হয়েছে। শুধু একখানা ক্রহাম রয়েছে, আর রয়েছে তিনটে রেসের ঘোড়া। পুরাতন আস্তানায় রয়েছে একমাত্র সহিস রামদীন আর কোচোয়ান জুমন।

সেই পুরাতন আস্তাবলের একখানা ঘরে আশ্রয় পেল স্মৃতীশ।

রামদীন বুড়ো হয়েছে। সকালে বিকেলে ঘোড়াকে দানা খাওয়ায়, ঘোড়ার গাত্রমার্জনা করে। জুমনের বয়সও পঞ্চাশের কাছাকাছি। সে বাস করে সপরিবারে। মোটর ড্রাইভার অনেকটা উঁচু পদের, কোচয়ানদের কোয়ার্টার তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। ওখানে ওরা থাকে না।

রতিকান্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে গেল।

সামনা সামনি কয়েক খানা একতলা ঘর। একখানা দর্মা দিয়ে ঘেরা। জুমন সেখানে বাস করে তার স্ত্রী নিয়ে। রামদীন থাকে পশ্চিমদিকের প্রথম ঘরখানায়। পূর্বদিকের শেষ ঘরখানা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে স্মৃতীশকে।

বিছানার পোঁটলা বাইরে রেখে স্মৃতীশ ঘর পরিষ্কার করে নিল।

কলিকাতা শহরের হৈ হট্টগোলের মাঝেও এই চত্বরে নিস্তব্ধতা অনাবিল ভাবে বিরাজ করছিল। সামনে এক জোড়া বকুল গাছ, সারি বদ্ধ সিজিন ফুলের ঝোপ। পরিবেশ বাহ্যত মনোরম। ঘর পরিষ্কার করে স্মৃতীশ পোঁটলা খুলে বিছানা পেতে নিল। স্নানের পর শ্যামঠাকুরের মন্দিরে প্রসাদ-ভোজী আরও কয়েকজনের মত নিজের পাতা নিজেই পেতে নিয়ে বসল।

প্রসাদ পাতে দেবার আগেই খাতা নিয়ে এসে দাঁড়াল গোমস্তা। খাতায় লিখে নিতে লাগল প্রসাদপ্রার্থীর নাম, বাবার নাম আর ঠিকানা। গোমস্তা কাছে আসতেই স্মৃতীশ কেমন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। অনেক কষ্টে নিজের নাম বলার পর বাবার নাম বলতে পারল না।

গোমস্তা তার নাম শুনেই বাবার নাম জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা করল, তুমি বুঝি হরিশপুর থেকে এসেছ ?

আজ্ঞে হাঁ। বলতে বলতে স্মৃতীশ যেন মাটির সাথে মিশিয়ে গেল। তার রক্তিম মুখ চোখের দিকে চেয়ে গোমস্তা আর প্রশ্ন করল না। ধীরে ধীরে খাতা হাতে নিয়ে পরবর্তী প্রসাদপ্রার্থীর দিকে এগিয়ে গেল।

কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। পথের ক্লান্তিতে ঘুমের গভীরতা বৃদ্ধি পেল, যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজবাড়ির চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। এমন সময় রাজবাড়ির জ্রহামে ঘোড়া জুতে জুমন গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল তারই সম্মুখ দিয়ে।

আস্তে আস্তে উঠে এসে স্মৃতীশ বসল বাগানের এক কোনায়। আকাশের মিট-মিটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ফুলের ঝোপে। বকুলের ছায়া এসে পড়েছে সেখানে। সেই ছায়ার অন্ধকারে বসে রইল স্মৃতীশ। আজই প্রথম অনুভব করল, আপন জন ছেড়ে আসার বেদনা। হয়ত এখন তুলসীতলায় প্রদীপ জেলে তার মা সন্তানের মঙ্গল কামনা করছে, হয়তবা শ্যামলী শেফালি বারান্দায় লণ্ঠন জেলে পড়তে বসেছে। কত কথাই মনে হতে থাকে।

বেমনা হয়ে স্মৃতীশ ভাবছিল। ভাবনার সূত্র ছিন্ন হল নারীকণ্ঠের ফিস্-ফিসানিতে। জুমনের দর্মাঘেরা বাসগৃহের সামনে পাতাবাহারের ঝোপে মিটমিটে চাঁদেব আলোতে দেখতে পেল একজন সুবেশধাবী পুরুষ এবং অবগুণ্ঠনবতী একজন স্ত্রীলোক। কে যে তারা জানবাব চেষ্টা করবার আগেই স্ত্রীলোকটি দর্মার দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। সুবেশধারী বাগানের পথ ধরে এগিয়ে গেল দেউড়ির দিকে।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল বাগানে। স্মৃতীশ মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠল।

চুপি চুপি উঠে সোজা এল শ্যামের মন্দিরে। প্রসাদ বিতরণের সময় হয়ে এসেছে। সময়মত হাজির হবার উপদেশ দিয়েছে দেবসেবার নায়েব।

দেবসেবার নায়েব প্যারীমোহন। বুড়ো হয়েছে রাজবাড়ির সেবা করতে করতে। সে বুঝেছে, রাজসেবার চেয়ে বড় সেবা পৃথিবীতে নেই। রাজার হুকুম তামিল করাই বাঁচবার পথ। বেঁচেও এসেছে। স্মৃতীশ মহারাজার খাস সুপারিশের লোক। মান্য বেশি। তার খাবার ব্যবস্থা আলাদা। এবেলায়ও স্মৃতীশ দুপুরের মত আঙ্গিনার এক কোনায় জায়গা করে নিয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে প্যারীমোহন নিজেই উঠে এল।

জিজ্ঞাসা করল, ওখানে কেন বসে আছ খোকা?

স্মৃতীশ মৃদুকণ্ঠে বলল, সবাই তো এখানে বসে।

সবাই আর তুমি এক নও। তোমার ব্যবস্থা আলাদা।

স্বতীশ শুধু মাথা নাড়ল। উঠে এসে নায়েবের সেরেস্তায় বসল।

এই বুঝি নতুন এলে কোলকাতায়?

আজ্ঞে হাঁ।

প্রথম প্রথম একটু লজ্জা লজ্জা মনে হয়। আমিও যখন প্রথম নয়নপুরে গিয়েছিলাম আমারও ওরকম হয়েছিল।

নায়েবমশায়ের হৃদ্যতায় স্বতীশ খুসী হল। অল্প বয়সে অপরের স্নেহ প্রাপ্তি আনন্দের আবেশ সৃষ্টি করে। দুর্দ্দমনীয় আবেগে স্বতীশ হঠাৎ বলে উঠল, একটা কথা বলতে চাই নায়েবমশাই।

নায়েবমশায় হেসে বলল, একটা কেন হাজারটা জিজ্ঞেস কর।

আমার বাসাটা ভাল লাগছেনা।

কেন বাপু। খাস রাজবাড়িতে বাস করছ। মন্দটা কি?

স্বতীশ বলতে গিয়ে থেমে গেল। কেন যে ভাল লাগেনি তা বলতে পারল না।

নায়েবমশায় আবার বলল, একদিনেই হাঁসফাঁস করছ। দেশের জন্য মন খাবাপ হচ্ছে, কেমন, তাই নয়?

হুঁ। কিন্তু পরিবেশটা ভাল লাগছেনা নাযেব মশাই।

দু চাব দিনে সয়ে যাবে। মনে ভাল না লাগলে আমাব এখানে এস। গল্প করব।

খেয়ে দেয়ে সে নিজেব ঘবে ফিবে এসে শোবাব বন্দোবস্ত করে নিল।

কে যেন ডাকল, খোকাবাবু।

স্বতীশ এগিয়ে এসে দেখল সন্ধ্যাবেলায় ব্রুহাম হাঁকিয়ে যে কোচোয়ান যাচ্ছিল সে এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

স্বতীশ বলল, আমাকে ডাকছ?

জুমন দরজায় বসে বলল, হাঁ।

অন্য কোন কথা খুঁজে না পেয়ে স্বতীশ বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

কোথায় যাই তার ঠিক নেই। মহারাণীমা যেখানে যেতে হুকুম করেন সেখানেই যাই। আজ গিয়েছিলাম ডামুনহরবার সড়কে। মহারাণীমাকে তোমার কথা বললাম খোকাবাবু।

স্মৃতীশ অনাহুত এই আত্মীয়তাকে বুঝতে পারল না। যে লোকটির সাথে তার কোন পরিচয় কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও ছিল না, সে তাকে নিয়ে এত ভাবতে পারে একথা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বোধহয় রাজবাড়ির ধারা এই রকমই। সামান্যকে বড় করে দেখবার মত রীতি বোধ হয় রয়েছে রাজবাড়ির আনাচে কানাচে।

স্মৃতীশ তবুও উদ্‌গ্রীবভাবে জিজ্ঞাসা করল, মহারাণী কিছু বললেন?

রাজা-রাণীরা কথা কম বলে। যা বলে তা হল হুকুম। তালিম করা নফরের কাজ। শুধু এত্তালা দিলাম। তুমি নতুন পড়শী। জুমন খক্ খক্ করে হেসে উঠল। হাসির শব্দ তক্ষকসাপের কণ্ঠস্বরের মত স্মৃতীশের কানে আঘাত করল।

আকাশে তখন চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকার ঘনতর হয়েছে। স্মৃতীশের এতক্ষণে হুঁস হল, একটি বাতির প্রয়োজন। জুমনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমার একটা লণ্ঠন দরকার, কোথায় কিনতে পাওয়া যায় বলতে পার?

বিজলী বাতি বুঝি নেই। আচ্ছা কাল সকালে আমার বিবিকে বলব, সে এসব ভাল জানে। সব ঠিক করে দিয়ে যাবে। আমি নানা কাজের মানুষ। তোমার কিছু দরকার হলে তাকেই বল। না, না, লজ্জা সরমের কথা নয়। বিদেশ বিভুঁইয়ে সবার মদদ নিতে হয় বুঝলে।

স্মৃতীশ কোন জবাব না দিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে বসল।

জুমন জিজ্ঞাসা করল, তোমার খাওয়া হয়েছে খোকাবাবু?

হাঁ। তোমার?

আমার হতে অনেক দেরী। এই তো এলাম। রামদীন ঘোড়াকে ঘাসদানা দেবে, সে সব তদ্বির করতে হবে, তারপর খাওয়া।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল, রামদীনটা পাক্কা চোর। দানা চুরি করে বিক্রি করে। পাহারা দিতে হয় বুঝলে। কি রকম বেইমান দেখ। হুজুরের দয়ায় বেঁচে আছিস। তোর বাপ চোদ্দপুরুষ বেঁচে গেল। আর তুই করিস কিনা ঘোড়ার দানা চুরি। আজকের দিনে ইমান নেই খোকাবাবু। কলকাতা শহর ধরেই চোর ছাঁচড়ের আড্ডা হয়ে গেছে।

স্মৃতীশ অত খবর রাখে না, রাখবার দরকারও হয়নি। নির্লিপ্তভাবে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে অপরের দোষ উদ্‌ঘাটন করা সুখকর মনে

হল না। প্রথম যতটা আন্তরিকতা অনুভব করেছিল, এখন সেই আন্তরিকতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। এই লোকটির উপস্থিতি কেমন যেন অসহ্য মনে হল তার। মুখ ফুটে বলতে পারছিল না, তুমি যাও। অসহায় ভাবে সে উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

জুমন রাজবাড়ির কোচোয়ান। বুদ্ধিব তীক্ষ্ণতার চেয়ে দুর্বুদ্ধির ধার তার বেশি। তাব উপস্থিতি প্রীতিকর নয় একথা সেও বুঝল, বলল, তোমার ঘুম পেয়েছে খোকা, শুয়ে পড়।

জুমন অনিচ্ছার সাথে উঠে গেল।

কাঁথা বিছিয়ে স্মৃতীশ শুয়ে পডল।

জীবনেব এই নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার পক্ষে সুখকর হয়নি। সাবা বাত ধরে ভাবল, এই আবেষ্টনীতে সে থাকতে পারবে কি না! নায়েব-মশায় বলেছে দুচাব দিনেই সযে যাবে। দুচাব দিন কাটাবার মত মানসিক প্রস্তুতি আছে কি তাব! ভেবেই পেল না।

গ্রীষ্মেব ছোট বাত পেবিয়ে গেল। সকালেব আলো ফুটতেই কাগজ কলম নিয়ে মাকে চিঠি লিখতে বসল।

দু তিন পৃষ্ঠা ভর্ত্তি কবে চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলল। মনঃপূত হল না। আবার লিখল। বিনিয়ে বিনিয়ে সব ঘটনা লিখল, লিখেই মনে হল, মাকে এসব কথা লিখলে মা চিন্তা করবে। নিজের সামঞ্জস্যহীন চিন্তা ধারা দিয়ে মাকে উৎক্ষিপ্ত করা মোটেই সমীচিন হবে না। অবশেষে শুধু লিখল পৌঁছান সংবাদ।

স্নান করে এসে বসল বোয়াকে।

দর্মার ঝাঁপ ঠেলে ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল জুমনের পরিবার।

সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা কবল তুমি এখানে আছ বুঝি?

অযাচিত ভাবে কোন নারীর সাথে পরিচয় করবাব মত দুঃসাহস স্মৃতীশেব ছিল না। কোন নারীও যে আলাপের সূত্র হঠাৎ খুঁজে নিতে পারে একথাও তার পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। আচ্ছন্ন ভাবে বলল, হাঁ।

নিজেকে জুমনের পবিবার বলে পরিচয় দিলেও স্মৃতীশ বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে মনে হিসেব করে ঠিক কবতে পারছিল না যে বক্তা জুমনের কন্যা অথবা স্ত্রী। উভয়ের বয়সের তাবতম্য এত স্পষ্ট, যে কোন লোকের সাধারণ দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়ে।

অবিশ্বাসের সঙ্গে স্মৃতীশ বলল, তুমি জুমনের ঝিঝি।

তাইতো বলছি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। না হয় ভালই। তোমার ঘরের বাতি ঠিক করে দিতে বলেছে। দেখি। বলেই দরজায় দাঁড়িয়ে সুইচের দিকে লক্ষ্য করে বলল, সবই ঠিক আছে, একটা বল্ নিয়ে এস। বুঝলে?

কথা শেষ করে ত্বরিত পদক্ষেপে জুমনের স্ত্রী দরমার দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেল। স্মৃতীশও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

জুমনের স্ত্রীর ফেরার পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল কাল সন্ধ্যার আবছা আলোতে একেই বোধহয় সে দেখেছিল। স্মৃতীশের কচি মন কেমন যেন টোল খেয়ে গেল। বিশ বাইশ বৎসরের এই যুবতী তার কাছে হয়ে গেল হেঁয়ালি।

শ্যামের প্রসাদ বেলা বারটার আগে বিলি হয় না। সে খবর কালকেই পেয়েছে। আজ প্রসাদের অপেক্ষা না করে কলেজের খোঁজে বের হতে হল। নীতিশের দেওয়া টাকা কয়টি ভর্তি হবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও, বইপত্র কেনার মত উদ্বৃত্ত হয়ত থাকবে না। সেজন্য ভর্তি হবার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

খোঁজ খবর করতে করতে এগিয়ে চলেছে। দুদিকে বিচিত্র বিপণির সারি। দোকানের পর দোকান। রাস্তায় ট্রাম বাস ছোটাছুটি করছে। সেই সাথে ছুটছে মানুষের দল। কেমন যেন ব্যস্ততা সর্বত্র। কর্মচঞ্চল মানুষের স্রোতে কেমন যেন অশান্তির ছাপ। কোথায় যেন কৃত্রিমতা বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে সহজ সরল মানুষের চোখেও ফুটে উঠছে। চলতে চলতে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। চলন্ত মানুষের স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে। বিরাট শহরের বিরাটত্ব যে মানুষদের নিয়ে তারা যেন যন্ত্রের মত ছুটোছুটি করছে।

এগিয়ে চলতে থাকে। কতটা পথ এসেছে হিসেব নেই। মনোহারী দোকানের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল তখনও বারটা বাজেনি। সামনে সাদা পোষাক লালপাগড়ি মাথায় কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করল, অমুক কলেজটা আর কত দূর?

হাত বাড়িয়ে সোজা উত্তরের রাস্তা দেখিয়ে বলল, ট্রামের রাস্তা বরাবর যেতে যেতে যেখানে ট্রাম বাঁ হাতে ঘুরে গেছে সেখানে জিজ্ঞাসা করে নিও।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে দাঁড়াল কলেজের সামনে। বিরাট লাল রঙ-এর বাড়িটার গায়ে লেখা রয়েছে কলেজের নাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে মনে হল, নয়নপুরের রাজাদের ইস্কুল বাড়িটা এবচেয়ে অনেক প্রশস্ত, অনেক বেশি আলো বাতাস সেখানে পাওয়া যেত। বিরাট এই বাড়িটা যেন বিরাট কয়েদখানা। নয়নপুরের মত সামনে বাগান নেই, খেলবার বিবাট মাঠ নেই। এখানে অপ্রশস্ত ভূমিতে ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে রুক্ষতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কলেজে ভর্তি হয়ে ফিরে এল পুস্তকের তালিকা হাতে করে। আসবার সময় পথটা তার দেখে নেওয়া হয়েছে। এসে উঠল ট্রামে। ট্রাম থেকে নেমে আবার চলতে লাগল পায়ে হেঁটে। যখন শ্যামের মন্দিরে পৌঁছাল তখন প্রসাদ বিতরণ শেষ হয়েছে। তাকে আসতে দেখে প্যারীমোহন উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, তোমার জন্যই বসে রয়েছি।

স্বতীশ এসে পাশে বসল। বলল, কলেজে ভর্তি হয়ে এলাম।

বেশ করেছ। এবার মন দিয়ে পড়াশোনা কর। লেগে পড় ভগবানের নাম নিয়ে। মনে রেখ, ভগবানের দয়া আর সহ্য করবার সামর্থ্য মানুষকে বড় করে।

স্বতীশ শুধু মাথা নাড়ল।

তার মনে পড়ল, কোলকাতা রওনা হবার সময় গৃহদেবতা বরাহদেবের আশীর্ব্বাদী ফুল হাতে দিয়ে সুখদাও এই কথাই তাকে বলেছিল। মানুষের গোষ্ঠীগত বিশ্বাস এক এবং অখণ্ড। স্বতীশ বিশ্বাস করে এই ঐতিহ্যের গরিমাকে কিন্তু শ্রদ্ধা করেনা যুগযুগান্তেব এই চিন্তাকে। নতুন বরে ভাববার ক্ষেত্র কি এতই অপরিসর। চুপ করে বসে ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে স্বতীশ আবার বাস্তবে ফিরে এল। ডাকল, নায়েব মশায়।

নায়েবমশায় হিসাবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, কিছু বলতে চাও ?

শ্যামের প্রসাদ পেতে বেলা বারটা বেজে যায়। আমাকে দশটার সময় রওনা হতেই হবে। তাই ভাবছি, যদি প্রসাদ কোথায় রাখবার ব্যবস্থা করেন তা হলে কলেজ থেকে ফিরে এসে খেতে পারতাম।

সেতো বেলা পাঁচটায়। আবার রাত নটায় রাতের প্রসাদ পাবে। এতে বাঁচবে কি করে ?

তাই ভাবছি।' ঠিক করেছি, সকালবেলায় জলটল খেয়ে কলেজে যাব। তিনটের সময় কলেজে ছুটি হবে, তারপর এসেই খাব।

মন্দ নয়। কিন্তু শরীরে সইবেতো?

তাতে যদি অসুবিধা হয়, শুধু রাতেই খাব। দিনে আর খাওয়া হবে না।

নায়েবমশায় বাধা দিয়ে বলল, ওকরে তো দিন যাবে না। দেখি তোমার কিছু ব্যবস্থা হয় কিনা।

স্মৃতীশ মৃদুস্বরে বলল আমার মা একবেলা খান। তাঁর দিনও যাচ্ছে, সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচেও আছেন। আমিতো তাঁরই ছেলে।

পাগল ছেলে। বলে স্মৃতীশের মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ নায়েব অশ্রুসজল চোখে বলল, দুঃখ করেই বড় হতে হয় ঠিকই, কিন্তু মানুষ বড় হয় কেন, জান? —মানুষ চায় দুঃখকে জয় করতে তাই বড় হয়। যেখানে দুঃখ জয় করবার পথ রয়েছে সেখানে দুঃখকে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে যারা নেয় তাদের আর যে কোন বুদ্ধি থাকুক বৈষয়িক বুদ্ধি নেই। বুঝলে? তোমার ব্যবস্থা আমি করছি।

শ্যামের বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্মৃতীশ চিঠি লিখল নীতিশকে। কলেজে ভর্তি হওয়া তার জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়। আনন্দের অতিশয্যে অনেক কথাই লিখল। আশার বাণী পরিবেশন করল। নিজেও আশান্বিত হয়ে বিকেল বেলায় ডাক বাক্সে চিঠি ফেলে দিয়ে এসে বসল বকুলগাছের তলায় রোয়াকে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। কালকের মত আজও ব্রুহাম নিয়ে জুমন বেরিয়ে গেল।

মিট মিটে চাঁদের আবছা আঁধারে সুবেশধারী কালকের লোকটিকে চুপে চুপে দরমার দরজা ঠেলে ভেতরে যেতে দেখল। জুমনের বিবির ক্ষীণ অথচ ভীত কণ্ঠস্বর তার কানে আসতে থাকে, পুরুষের বাক্যালাপও যে না আসছিল এমন নয়। কিন্তু এত মৃদু সে কণ্ঠস্বর যে বক্তব্য মোটেই স্পষ্ট নয়। কালকের মত আজকেও দুজনকে দরমার দরজা ঠেলে বাইরে আসতে দেখল। চকিতে সুবেশধারী অন্তর্ধান হল, ত্বরিত পদে জুমনের বিবি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

ধীরে ধীরে উঠে এসে বসল নিজের ঘরের দরজায়। বকুলের ছায়া এসে পড়েছে সেখানে। আনমনে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। হুঁস ফিরে এল রামদীনের আহ্বানে।

বাবুজী।

স্মৃতীশ মুখ তুলতেই দেখল, সুঠামদেহ পক্ককেশ রাজবাড়ির সহিস রামদীনকে। আগেও তাকে দূর থেকে দেখেছে। পরিচয় তার হয়নি। জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কিছু বলছ ?

হাঁ হাজুর। আপনি আমাদের পড়শী তাই মোলাকাত করতে আসলাম।

বস, বলে স্মৃতীশ তাকে বসবার মত জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল।

রামদীন বসল না নিরাপদ দূরত্ব রেখে জিজ্ঞাসা করল, কতদিন এখানে থাকবেন ?

তাতো বলতে পারি না। দু চার ছয় বছরও হতে পারে।

রামদীন মনে মনে হিসাব করল। বলল, আমিও জানতাম না কতদিন এখানে থাকব। দেখতে দেখতে চল্লিশ সাল হয়ে গেছে।

তুমি চল্লিশ বছর এখানে আছ ?

ঠিক এখানে নয়। আগে ছিলাম নয়নপুরে। সেখানে ছিলাম বাইশ সাল। হাজুর বাহাদুর কলকাতায় এলেন, আমরাও এলাম। তাও বিশ সাল হতে চলল। আর বেশি দিন থাকব না হাজুর। বুড়ো হয়ে গেছি। এবার দেশে ফিরে যাব। রাজা-মহারাজা লোক তো আর ঘোড়া রাখছে না। হাওয়া গাড়ি এসেছে। আমাদের রুজি রোজগারও শেষ হয়েছে। মহারাণী দয়া করে একটা গাড়ি রাখলেন, নইলে আগেই যেতে হত।

তোমার বাড়ি কোথায় ?

বাড়ি, তা ঠিক মনে নেই, আট সাল উমর যখন তখন এসেছি নয়নপুর। বিশ সাল যখন উমর তখন থেকে রাজবাড়িতে আছি। এই দেশই আমার দেশ।

কখনও নিজের দেশে যাওনি।

একদম যাইনি হাজুর। এই মুলুকই আমার সব।

রামদীন ব্যস্ততার সাথে ফিরে যেতে যেতে থামল। স্মৃতীশের সামনে এসে চুপি চুপি বলল, জুমন মিঞার বিবিকে সকাল বেলায় আপনার ঘরে দেখলাম। ওকে আসতে দেবেন না খোকা বাবু।

কেন ? বলেই স্বতীশ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

এমনি, ওরা মুসলমান কি না।

মুসলমান কি খারাপ ?

মুসলমান খারাপ নয় হাজুর। ওরা নামেই মুসলমান, তাই ওদের ভয় করতে হয়।

স্বতীশ কিছু বলবার আগেই রামদীন পথ ধরল।

রাজবাড়ির রাজকীয় আবহাওয়া কেমন ঘোলাটে মনে হল। নীরবে বসে থাকতে থাকতে মানসিক কেমন অশান্তি অনুভব করতে লাগল। দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে এসে বসল নায়েব মশায়ের সেরেস্তায়। স্বতীশের মনে হল বান্ধবহীন এই বিশাল নগরে এই বৃদ্ধটিই তার একমাত্র সুহৃদ যার কাছে সে পথ চলবার উপদেশ ও নির্দেশ পাবে।

অসময়ে স্বতীশকে আসতে দেখে নায়েবমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?

না।

বই পত্তর কেনা হয় নি, পড়াশোনাও আরম্ভ করনি, কেমন ?

আজ্ঞে হাঁ।

নায়েবমশায় নিজের কাজে মন দিল। স্বতীশ বলল, একটা কথা বলব ভাবছি।

স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ বলল, বল।

স্বতীশ চুপি চুপি দুই দিনকার ঘটনা বিবৃত করল। নায়েবমশায় অভিনিবেশ সহকারে তার কথা শুনে চিন্তিত ভাবে বলল, এ কথা কাউকে বলেছ ?

না।

কাউকে বল না। বড় ঘরের বড় কথা। রাজা বাদশাদের কথায় আমাদের মত চুনোপুঁটির কি দরকার।

নায়েবমশায় গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। স্বতীশ ওসব কিছু না বুঝে চুপ করে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর নায়েব মশায় বললেন, খোকা।

আজ্ঞে।

তুমি এসেছ পড়াশোনা করতে, পড়াশোনা করবে, যা কিছুই ঘটে ঘটুক,

চোখ বুঁজে থাকবে। পরের হুজ্জতে মাথা গলানো বড্ডই কষ্টকর হয় পরিণামে। যারা বুদ্ধিমান তারা ভাগ্য তৈরী করে বুদ্ধি দিয়ে। তুমি ছেলে মানুষ সব বুঝবে না। আমার জীবনে অনেক দেখেছি। চোখকে মনের শাসন দিয়ে বন্ধ রাখবে। দুনিয়াতে সব কিছু সব সময় ভাল পাবে না। সংমিশ্রন হল পৃথিবীর বিশেষত্ব। মানিয়ে চলা হল মানুষের ধর্ম। বুঝলে?

স্বতীশ মাথা নাড়ল। কোন জবাব দিল না। সোজা ফিরে এসে বসল তার ঘরের দরজায়। আকাশের জ্যোৎস্না বাগিচার মাথায় আলো আঁধারির মেলা বসিয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল তার দেশের রথের মেলার কথা। আর কদিন? রথতো এসে গেছে। নয়নপুরের গুপ্তাবাড়িতে সাতদিন যাত্রা হবে। বছর বছর জলকাদা ভেঙ্গে যাত্রা শুনতে গেছে। এবারও মেলা বসবে, যাত্রা হবে, সেই উৎসবে সব রইবে, রইবে না সে নিজে। অথচ গত বছরও মাকে লুকিয়ে পরীক্ষার পড়া নষ্ট করে সে যাত্রা শুনতে গেছে। যাবার বেলায় নিতাই মুদির দোকান থেকে রোজ একপয়সার নস্যি কিনে নিয়ে যেত। শেষরাতে ঢুলুনি আরম্ভ হলে নাকে নস্যি দিয়ে হাঁচো হাঁচো করে হেঁচে ঘুম তাড়াত। সকাল বেলায় সারা রাতের ক্লান্তি নিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে বাড়ি এসে নয়নার নতুন বর্ষার জলে স্নান করেই দিত ঘুম। আবার সন্ধ্যা বেলায় অবসর খুঁজত সুখদার অন্যমনস্কতার সুযোগে রওনা হবার।

সুখদা বহুবার অনুযোগ করেছে। তবুও তাকে বাঁধন দিতে পারেনি। যাত্রাগানের আকর্ষণ সে ত্যাগ করতে পারেনি।

খেয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত অনেকটা হবে।

জুমনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল।

ঘুমিয়ে পড়েছ খোকা বাবু?

হাঁ। কটা বাজে?

দশটা হবে। এত সকাল সকাল তুমি ঘুমোও।

স্বতীশ মৃদু হাসিতে মুখ ভাড়িয়ে বলল, রাত দশটা। পাড়াগাঁয়ে অনেক রাত। কাজ কর্ম না থাকলে এ সময় আমরা ঘুমিয়েই পড়ি।

জুমন কি যেন ভাবল।

স্মতীশ পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, কিছু বলবে ?

আপ্যায়িত ভাবে জুমন বলল, আজও তোমার কথা মহারাণীকে বললাম।

স্মতীশ জবাব দিল না।

জুমন নিজের মনেই বলল, কাল বিকেলে মহারাণী যখন বের হবেন তখন গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেক। তার নজরে পড়লে, চাই কি তোমার বরাত ফিরে যেতেও পারে। রাজা বাদশার নজর আর দিল্ একসাথে থাকলে ছনিয়ার চেহারা বদল হয়ে যায়, বুঝলে খোকাবাবু !

জুমন উঠে গেল।

স্মতীশের চোখের সামনে নতুন জগতের ছবিগুলো কেমন যেন বেখাপ্পা হয়ে দেখা দিচ্ছিল। অসহ্য না হলেও প্রীতিকর নয়। দেখবার নয়, অথচ দেখতে হয় ; বলবার নয়, না বললেও প্রাণ হাঁস ফাঁস করে।

৫

গৃহসজ্জার উপকরণের অন্তরালে গৃহ মার্জ্জনার ঝাড়ণের অবস্থিতিকে মনে রাখবার প্রয়োজন হয় কিন্তু রাজবাড়ির হৈ-হাঙ্গামায় এবং প্রাণহীন সাজ সজ্জাব অন্তরালে যে যুবকটি একান্তে বসে থাকে তাকে মনে করবার প্রয়োজন কারুর হয় না। পরোক্ষে হোক অথবা অপরোক্ষে হোক কোচয়ানদের আস্তানায় তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এলেই সে উপলব্ধি করত এই বিশাল পুরীতে তাব প্রকৃত মূল্য কত। রূঢ় চেতনা যেন তার কানে কানে বলে দিত, এই বিলাস বৈভবের আড়ম্বর রয়েছে বলেই নীচুতলা রয়েছে, আর নীচুতলা রয়েছে বলেই তার আশ্রয় সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

প্যারীমোহনের নির্দ্দেশ সে অনুধাবন করত, সে বুঝেছিল, মানিয়ে চলাই তার ধর্ম।

প্রথম যেদিন কলেজ খুলল, সেদিনই তার নজরে পড়ল, তার জন্য চিন্তা করবার লোকও আছে। প্যারীমোহন স্বগৃহে তাকে ডেকে নিয়ে খেতে বসাল। বলল, সকাল বেলায় যা হোক সেদ্ধ ভাত এখানে থেকেই খেয়ে যেও।

প্যারীমোহনের স্ত্রী খেতে দিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, খেতে কষ্ট হবে বাবা।

স্মৃতীশ উত্তর দিল প্যারীমোহনকে। বলল, সকাল বেলায় সেদ্ধ ভাত খেয়েই ইস্কুল করেছি, ওতে আমার কষ্ট হবে না, বরং মনে হবে দেশের বাড়িতেই বাস করছি।

খাওয়া শেষ করে বই বগলে নিয়ে রওনা হল। রাস্তায় চলতে চলতে ছোট বেলাকার কথা তার মনে পড়তে লাগল। নবান্নের পর সকাল বেলায় আতপ চালের ফেনা-ফেনা ভাত আর নতুন আলুপোড়া খাওয়া ছিল শীত-কালের বৈশিষ্ট। সুখদা বসে বসে খাওয়াতো। ভাই বোনেরা মিলে থালা চেটে খেয়ে উঠত। আজও সেই রকমই আহার্য সে পেয়েছে, পায়নি শুধু মায়ের স্নেহকরুণ দৃষ্টি। স্নেহ করুণ না হলেও সহানুভূতির স্পর্শটুকু সে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে।

রাজবাড়ির চত্বরে সাজ সজ্জার অন্তরালে কেবল মাত্র একজনের প্রয়োজনই

মুখ্য। অপরের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে একথা কারুরই মনে করবার অবসর থাকে না। সেখানে স্নেহ অমূল্য পদার্থ, সহানুভূতি অজ্ঞাত বস্তু, রয়েছে শুধু করুণা। করুণার নির্মম পরিবেশে কাঙাল মন দম বন্ধ হয়ে মরে যায়। করুণাকে স্মৃতীশ শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। কিন্তু বাস্তবের সংঘাত যত কঠোর হতে থাকে, ততই তার মনে হয় অভিজাতের করুণাও একটি বিলাস। বিলাসের নানা উপকরণের মত কারুণ্য একটি উপকরণ। ভাল করে জানবার সৌভাগ্য যত হতে থাকে ততই ক্ষিপ্ত হতে থাকে তার মন। প্যারীমোহনের উপদেশটুকু সে অবাস্তব মনে করেনি, উপদেশের বাস্তব দিক সে মেনে চলেছে অথবা চলতে বাধ্য হয়েছে, নইলে তার মত নিরুপায় ব্যক্তিও হয়ত তিক্ততা বমন করতে দ্বিধা করত না।

কলেজের নতুন পরিবেশে নতুন সঙ্গীসাথীর সাথে পরিচিতি তার আসল অথচ অপ্রার্থিত জীবন যাত্রার প্রণালী থেকে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে যেত তাই সে সুস্থ মন নিয়ে বাঁচতে পেরেছিল। সঙ্গীদের সুন্দর পরিবেশ আপন করে নিতে চেষ্টা করেছে, নইলে পাঠ্যজীবনকে আঁকড়ে ধরতে সে হয়ত পারত না।

সেদিন আকাশ ফুটো করা জলের ধারা নেমেছে। কলেজে যাওয়া আর হয়নি। নিজের ঘরে জানালার ধারে বসে বসে ভাবছিল, বর্ষা দিনের অতীত জীবন। রামদীন এসে তার ধ্যানভঙ্গ করে নীতিশের চিঠি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সংবাদ সামান্য নয়। জেলার ভিত্তিতে সে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়েছে। চিঠির নীচে আঁকা বাঁকা অক্ষরে শ্যামলী-শেফালি আনন্দের আতিশয্যে ছোড়দাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সবার শেষে মা লিখেছে, আমার দেবার মত কিছু নেই, রয়েছে শুধু দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবার ক্ষমতা। সেইটুকুই দিলাম।

স্মৃতীশের স্বজন বলতে এমন কেউ নেই যাকে এই সংবাদ জানিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। মনের আনন্দ প্রকাশ করবার কোন কেন্দ্র না থাকলে মানুষ কত বেশি মুষড়ে যায় সে বেদনা স্মৃতীশ মর্মে মর্মে অনুভব করল। সংবাদ পাবার যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র নায়েবমশায়। রাতের বেলায় তাকে খবর দিয়েও পরিতৃপ্তি হল না। সৌভাগ্যকে হিংসা করবার মত লোক যদি না থাকে, সে সে সৌভাগ্য মূল্যহীন। অন্যের ঈর্ষা উৎপাদন না করলে সৌভাগ্য মিইয়ে

যায়। স্বতীশ খুঁজে পেল না এমন দ্বিতীয় জন যাকে সংবাদ পরিবেশন করা যায়।

পরদিন সৌভাগ্যবশত ইংরেজীর অধ্যাপক ক্লাশে জিজ্ঞাসা করলেন, Any Scholar in the Class ? —দু জন উঠে দাঁড়াল। স্বতীশ আর প্রবীর। দু জনেই বিভিন্ন দুটো জেলা থেকে বৃত্তি পেয়েছে। সৌভাগ্য একার নয়, প্রতিষ্ঠাও উভয়েরই, তবুও দেড়শত ছাত্রের ক্লাশে তাদের গৌরব লক্ষ্য করতে তিনশত চোখ বিস্ফারিত হল, এই হল তার প্রতিষ্ঠা এবং সৌভাগ্যের বিনিময়। স্বতীশের আনন্দ অব্যক্ত অথচ অনুশোচনায় প্রান্ত নয়, আজ তার বলবার কেন্দ্র ব্যাপকতা লাভ করেছে। অকল্পনীয় এই সুযোগ সৃষ্টি করেছিল যে অধ্যাপক তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বতীশ এসে বসল কমন রুমে। এক কোনায় ইংরেজী মাসিক পত্র হাতে নিয়ে বসে রইল বেমনা হযে।

স্বতীশ লাজুক নয়, কিন্তু উপযাচক হযে মেলামেশা করবার মত শহুরে কায়দায়ও সে রপ্ত করেনি। নইলে বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার সুযোগ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ সে কখনও গ্রহন করেনি।

স্বতীশ মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টোতে উল্টোতে ভাবছিল, কলিকাতার মত শহরে না থকলে জানবার, শিখবার কতই না বাকী থেকে যেত। ছোট শহর আর গ্রামে সব কিছুই প্রাকৃতিক পরিবেশে মনোরম কিন্তু মনের সম্পূর্ণতা আনবার মত অনেক কিছুরই সেখানে অভাব।

পেছন থেকে প্রবীর এসে কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় থাক ভাই ?

স্বতীশ মুখ ফিরিয়ে প্রবীরের দিকে চেয়ে হাসল।

কথা বলবেনা বুঝি ? অনুযোগ করল প্রবীর।

রাজবাড়িতে। ঘাবড়ে গেলে দেখছি। রাজবাড়িতে রাজাই শুধু বাস করে না, বাদশার সাথে নফরও বাস করে। আমি নফর।

প্রবীর হাসল। বলল, তা হলেও তুমি রাজঅতিথি অর্থাৎ ক্ষুদে রাজা।

স্বতীশও হাসল। বলল, তা যা বল তাই। ক্ষুদে রাজা! তা বটে! রাজার অতিথি সব সময় রাজা হয় না। গোলাপের বাগিচায় আমি একটি ঘেঁটু ফুল। রূপও নেই, গন্ধও নেই, বুঝলে। আর নেই উন্মুক্ত জীবন। আলো বাতাসহীন কারাগৃহের অন্তরালেও নিজস্বতা থাকে, নফরের জীবনে তাও থাকে না।

প্রবীর ক্ষুন্নভাবে বলল, থাকা আর না থাকা জীবনের হিসাবের খাতায় বিরাট বঞ্চনা। অনুপাত হিসাব করলে আফশোষ করবার কিছু থাকে না। বরং যে জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছ সেখানে যদি সত্যকার মন নিয়ে থাক তাহলে অর্থের নগ্নতা ও মানসিক রুগ্নতার মাঝদিয়ে নিজস্ব জীবনের ধারা প্রস্তুত করবার ক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

প্রবীরের কথা স্মৃতীশ ঠিক বুঝতে পারল না। সেদিন না বুঝলেও কয়েক দিনের মধ্যেই প্রবীর তাকে বুঝিয়ে দিতে ক্রুটি করল না। চোখের সামনে আঙ্গুল তুলে ধরে বলল, কলেজের কেতাবের বাইরে আরও বড় জগৎ রয়েছে, সেদিকে চোখ মেলে দেখ ভাই। দুনিয়াকে জানবার পাঠ এখনও আমাদের আরম্ভ হয়নি।

নীতিশের চিঠি পাওয়া অবধি ভেবেছে মহারাজাকে তার বৃত্তি পাবার সংবাদটি জানালে ভাল হত। আবার মনে হয়েছে তার বৃত্তি পাওয়া অথবা না পাওয়া মহারাজার প্রাত্যহিক জীবনে কোন সংবাদই নয়। হাজার হাজার উট্‌কো সংবাদের মত এত একটি অনাবশ্যক সংবাদ মাত্র।

রাতে বসে বসে তিনপৃষ্ঠা ধরে মাকে চিঠি লিখল, নীতিশের জবাব লিখল, বোনেদের স্নেহাশীষ জানাল।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আবার মনে হল, মহারাজাকে সংবাদ দিলে ক্ষতির কোন কারণ যখন নেই তখন সংবাদটা দিতেই বা আপত্তি কিসের।

রামদীনের নিকট সংবাদ পেল মহারাজা দশটা নাগাদ দরবার ঘরে বসে। সেখানেই তার সাথে দেখা করা সুবিধাজনক। প্রস্তুত হয়ে নিল মহারাজার সাথে দেখা করতে। ভেবে পেল না মহারাজাকে কি নামে সম্বোধন করবে। 'হুজুব'; না, কেমন ছোট ছোট ভাব রয়েছে এই শব্দেব তলায়। 'মহারাজা-বাহাদুর',—অনেকটা মানান সই এই সম্বোধন। এইটেই বোধহয় প্রাপ্য। ধীরে ধীরে দরবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, অথচ ঠিক করতে পারল না, কি ভাবে তার বক্তব্য পেশ করবে।

খাস বেয়ারা রতিকান্তকে সুপারিশ ধরতে হল।

দেখি হুজুব বাহাদুর কি করছেন, একমিনিট দাঁড়াও। বলেই রতিকান্ত পর্দার অন্তরালে আত্মগোপন করল। এক মিনিট এক মিনিট করতে করতে

অনেক মিনিট পেরিয়ে গেল, রতিকান্তের প্রত্যাবর্তন ঘটল না। স্মৃতীশ জানত না, রাজা মহারাজাকে এত্তালা দিতে হলে খাস বেয়ারাদের সেলাম ও সেলামি দিতে হয়। তার অজ্ঞতাপ্রসূত আবেদন ফলপ্রসূ হল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন রতিকান্তের সাক্ষাত ঘটল না, তখন হতাশ হয়ে ফিরে চলল।

কি চাই খোকা?

কণ্ঠস্বর পরিচিত। স্মৃতীশ ফিরে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজা স্বয়ং। তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আমি স্কলারশিপ্ পেয়েছি। বলতে বলতে আনন্দের আতিশয্যে চোখ জলে ভরে উঠল।

মহারাজা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেন চিনতে পারল। বলল, তুমি যতীশের ছেলে, না? হাঁ, মনে পড়েছে। স্কলারশিপ্ পেয়েছ, বড় আনন্দের কথা। সৌভাগ্য তোমার মায়ের যিনি তোমাকে পৃথিবীর সাথে পরিচয় করে দিয়েছেন।

স্মৃতীশ লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

তোমার বাবা যতীশকে আমি জানতাম, বেশ ভাল করেই জানতাম। মহারাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তখন তোমার জন্ম হয় নি। নয়নপুরে খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল। নয়নপুরের রাজার বরকন্দাজের সাথে হাতীসিংহ জমিদারদের দাঙ্গা। সম্পত্তি থাকলেই এরকম হয়ে থাকে। বিশেষ করে উভয় পক্ষ যেখানে শক্তিমান, সেখানে এর পরিণতিও সুদূরপ্রসারী হয়। একজন খুন হয়ে গেল। সেই মামলার প্রধান সাক্ষী ছিল তোমার বাবা।

মহারাজা থামলেন। পকেট থেকে চুরুট বের করে জ্বেলে নিলেন। একমুখ ধুঁয়ো ছেড়ে আবার বললেন, সব কথা আজ আর মনে নেই। তোমার বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে কথা মনে আছে। মনে রাখবার আরও কারণ আছে। তোমার বাবাকে বললাম, তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

যতীশ রাজি হল।

বললাম, সে সাক্ষ্য হবে আমার পক্ষীয়।

যতীশ রায় এবার রাজী হলনা। বলল, যা জানি তাই বলব। সে সাক্ষ্য কার পক্ষীয় হবে তার বিচারের ভার আমার নয়।

যতীশের কথায় বিনয় ছিল, কিন্তু কথ্য বিষয় কঠিন অথচ

বাস্তব। আমি নয়নপুরের মহারাজা। রাজত্ব শাসন করবার ক্ষমতা নেই কিন্তু রক্তচক্ষু প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল। আমার কথার ওপর কথা বলবার এক্তিয়ার অপরের থাকবে এ হেন অসহ্য। সত্য হোক মিথ্যা হোক আমার পক্ষে তাকে সাক্ষ্য দিতেই হবে। হুকুম দিলাম।

অল্প বয়স, ক্ষমতাহীন মহারাজা, তারই হুকুম। চমৎকার। তবুও অর্থের আর আভিজাত্যের দম্ভ উত্তেজনা সৃষ্টি করল, বললাম তোমাকে আমার হয়েই সাক্ষ্য দিতে হবে।

যতীশ তেজস্বীর মত দাঁড়িয়ে বলল, যে নিজের পিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত সে অপরকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করতে পারে, কিন্তু পিতৃপরিচয়ে যে বলিষ্ঠ সে মিথ্যা বলতে ঘৃণা বোধ করে।

গর্জ্জে উঠলাম, বললাম, সাবধান যতীশ। তেঁতুলতলার খুন এখনও ভুলবার সময় হয়নি।

সেটাও যেমন ভুলি নাই, তেমনি ভুলি নাই হরিশপুরের হরকান্ত ঠাকুরের ছেলে তাসের ঘরের রাজা হয়ে তাজা মানুষকে ধমকাতে সাহস পায় শুধু অর্থের আধিক্যে। যতীশ রায় মরতে ভয় পায় না।

পেয়াদারা শঙ্কিত হল। যতীশ কোন দিকেও ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

তুমি তার ছেলে। আজকে শুধু তোমায় আশীর্ব্বাদ করব, বড় হও, পিতার মত তেজস্বী হও, তাসের ঘরের রাজা হয়ো না। রতি।

হুজুর, রতিকান্ত এসে দাঁড়াল।

শ্যামের বাড়িতে মানত পূজো দিতে বলিস। যতীশের ছেলে জলপানি পেয়েছে, বুঝলি।

রতিকান্ত বেরিয়ে গেল।

যতীশও তার পিছু পিছু রওনা হতেই মহারাজা ডাকলেন, দাঁড়াও।

মহারাজা তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে বোধহয় কোন অতীতের কথা ভাবছিল। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই যতীশের মতই চেহারা, তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি উন্নত।

জিজ্ঞাসা করল, তোমার কোন কষ্ট হয় এখানে?

না হুজুর।

হুজুর! কে তোমাকে হুজুর বলতে শিখিয়েছে?

কেউ শেখায়নি, সবাই বলে তাই বলেছি।

সবাইকার সাথে তোমার ব্যবধান অনেক বেশি। আর কখনও বলবেনা। যারা হুজুর বলে তারা আমার বেতনভোগী। যারা সামনে হুজুর বলে তারাই পেছনে শালা বলে। দু পয়সার জায়গায় চার পয়সা পেলে বলে, রাজা শালা বোকা। তুমি কি তা পারবে? পারবে না। আমার দয়াকে তুমি মনে কর গর্বের মিছিল, আমার বোকামিকে তুমি মনে কর বিলাস। নয় কি? অতটা এখনও বুঝি ভাবনি। বেশ। তা বলে হুজুর বলে ডেক না।

স্মৃতীশ লজ্জায় মাটির সাথে মিশিয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদি কোন অসুবিধা হয় সোজা আমার কাছে এসে বলবে। কারও সুপারিশ ধরতে হবে না, !

স্মৃতীশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

যেতে যেতে ভাবছিল, বিচিত্র এই মহারাজা। ঠিক বুঝতে পারল না তাকে। যতীশ সম্বন্ধে মহারাজা যা বললেন, সে কথা আগে অনেকবার সে শুনেছে। গর্ব অনুভব করেছে। হরকান্ত শাক ভাত খেয়ে ইহকালের মামলা শেষ করেছে, তারই পুত্র মহারাজা। গর্ব করবার কিছু রয়েছে কি! কিন্তু পিতার তেজস্বিতা রক্ষা করতে স্মৃতীশ পেরেছে কি? —স্মৃতীশ ভেবে ঠিক করতে পারল না।

কলেজের কমন রুমে প্রবীরকে গোপনে ডেকে বলল, আজ রাজদর্শন করে এলাম।

সৌভাগ্যের কথা অপরকে বলতে হয় না, পূণ্যলাভ কম হয়।

প্রবীর হাসল।

স্মৃতীশও হাসল।

অনেক সময় মনে হয় রাজা আর আমি একই পরিবারের দুই ভাই। স্থান বদল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তখন কি আমিও ওদের মত চলতে

পারতাম ? হয়ত পারতাম। তারই বুঝি ট্রেনিং নিচ্ছি। আমি থাকি আস্তাবলে, আর রাজা থাকে প্রাসাদে। এই হল ভগবানের বিচিত্র খেলা।

ভগবান, তা বটে। দশজন উপোসীর আহার্য একজন ভোজন করে এও ভগবানের বিচিত্র লীলাখেলা। যেদিন ভোগী উপোসীর সামনে উচ্ছিষ্ট ক্ষুদকনা ছড়িয়ে দেয়, সেদিনও মনে হয় ভগবান রয়েছেন নইলে ক্ষুদকনাও জুটত না।

প্রবীরের মন্তব্যে স্মৃতীশ বাধা পেল, বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারল, তার বক্তব্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলেই প্রবীর তার বক্তব্যকে মূল্য দিতে চায় না। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বলতে চাও ?

বলতে চাই ! কর্ণ কৌরব সভায় বলেছিল জন্ম তার পরিচয় নয়, কর্ম তার পরিচয়। কর্ণের ভাষায় বলতে চাই, জন্মের আভিজাত্য মিথ্যা, মিথ্যা ভগবানের নামে দোষারোপ। ঐ আস্তাবল আর প্রাসাদের মাঝখানটায় যে ব্যবধান রয়েছে, সে ব্যবধান মানুষের সৃষ্টি। বেচারা ভগবান তার জন্য মোটেই দায়ী নয়।

স্মৃতীশ চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল। মনে হল, রাজা আর নফরের তারতম্য জন্মগত নয়। তারতম্য সৃষ্টি করা হয়েছে যুগ যুগান্তের অদমনীয় স্বার্থের আস্ফালনে। তাই কি সত্যি ? কোন নির্দ্দিষ্ট মতে আসতে না পেরে স্মৃতীশ চুপ করে বসে রইল।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ ?

ভাবছি না। চল, ক্লাশে যাই।

একটা কথা বলতে চাই, শুনবে ?

স্মৃতীশ তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইল।

আমার কাকা বলছিলেন তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে ? যাবে ভাই ?

যাব। আজ নয়, আর একদিন।

আজই চল। কলেজ থেকে ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়েই যেও।

তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই যাব, তবে বারবার নয় একবার। কিন্তু ভাই কারুর বাড়ি যাওয়াটা আমার সহ্য হয় না। সারা ছুনিয়া বেড়িয়ে আসতে বল তাতে রাজি আছি কিন্তু কারুর বাড়ি যেতে বললে পা ভেঙ্গে

অচল হয়ে যায়। কেন যে সহ্য করতে পারিনা জানিনা। মনে হয় গৃহকোণের চার দেওয়ালের চাপে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

স্মৃতীশ থেমে সাময়িক পত্রের পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ বলল, বেশ আজই চল।

কলেজের কাছেই প্রবীরদের বাসা। ছোট গলির শেষ কোনায় পুরাতন দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় প্রবীরের কাকা সপরিবারে দু খানা ঘর নিয়ে বাস করে। একখানায় ছেলেদের থাকার ও পড়ার ব্যবস্থা অপরখানায়, গৃহস্বামী কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। সামনে তিন ফুট মাপের টানা বারান্দার ক্ষুদ্র একটি অংশ দর্মা ঘেরা, সেখানে রান্না হয়। উঠোনে বারোয়ারী কল ও পায়খানা। দিনের বেলায় আলো না জ্বাললে গোটা নিচের তলা চোখে পড়েনা।

উঠোনে পা দিয়েই স্মৃতীশ অশান্ত হয়ে উঠল। সারা শরীর ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। উন্মুক্ত আলো বাতাসে এতকাল বাস করে এসেছে, কলিকাতায় রাজবাড়ির পরিবেশ যাই হোক, বাসস্থানটুকু মোটেই হতাশাব্যঞ্জক নয়। মনে মনে ভেবে নিল, রাজবাড়ির আস্তাবলের চেয়েও নিকৃষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানুষের দলে প্রবীরের মত মেধাবী ছাত্র যদি বাস করে, তা হলে শহরের আসল রূপ আরও কত ভয়ঙ্কর, বোধহয় অকল্পনীয়। চলতে চলতে থমকে যেতে লাগল।

উঠোনের কলতলায় একগাদা থালা বাটি নিয়ে প্রবীরের খুড়তুতো বোন লতিকা গৃহস্থালী কর্মে ব্যস্ত। ছাই দিয়ে ঘসে মেজে বাসন পরিষ্কার করছে।

প্রবীর তাকে ডাকল, এই দেখ লতু কে এসেছে ?

লতিকার বয়স তের বছর বোধহয় পার হয়নি। দেহের পরিমাপ এবং সাজসজ্জায় তাকে দশবছরের চেয়ে বড় মনে হয় না। স্মৃতীশ তার কর্মনিপুন হস্তচালনার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। প্রবীর পরিচয় করিয়ে দেবার মত উৎসাহে বলল, আমার বোন লতিকা, সেভেন-এ পড়ে।

স্মৃতীশের ঠোঁটের গোড়ায় ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল।

প্রবীর টানতে টানতে তাকে নিয়ে এসে নিজের ঘরে বসাল।

ঘরখানার ছিরি নেই সাজ আছে। নতুন পুরাতন আঠার-বিশখানা ক্যালেণ্ডার গা বেঁকিয়ে পেরেক মাথায় নিয়ে দেওয়ালে ঝুলছে। একপাশে দুখানা কেরাসিন কাঠের সেল্‌ফে গাদা দিয়ে বইখাতা পড়ুয়াদের

অস্তিত্ব জানাচ্ছে। কতকাল যে ঘরে কলিটানা হয়নি তা বোধহয় বাড়ির মালিক বিনা আর কেউ বলতে পারবে না। দরজার সামনে দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, আশে পাশে দেওয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে নানা রকমের ছবি, এমন কি বোম্বাই মিলের শাড়ির লেবেল পর্যন্ত। ভেঙ্গেপড়া পলেস্তারা কাগজের বোঝার তলে ঢাকা পড়ে গেছে। এক কোনায় গাদা দেওয়া রয়েছে বিছানা বালিশ কাঁথা। এসকল বস্তুর কোন কালে রঙ ছিল, রূপ ছিল, চাকচিক্য ছিল, আজ শুধু তেল আর ময়লার উজ্জ্বল মেটে রঙ রয়েছে। তারও বুকে রয়েছে ছেঁড়া কাপড়ের পটি। বহুরূপীর সাজের মত অপূর্ব মূর্ত্তি।

স্মৃতীশ অবাক হয়ে দেখছিল।

তাকে বসতে দিয়ে প্রবীর গেল তার কাকিমাকে ডাকতে।

অতি জীর্ণ, হাঁপানীর টানে প্রায় রুদ্ধশ্বাস মধ্যবয়সী শীর্ণ মহিলার হাত ধরে নিয়ে এসে প্রবীর বলল, আমার কাকিমা।

স্মৃতীশ প্রণাম করল।

অনেকটা দূরত্ব রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে প্রবীরের কাকিমা বসলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তোমার কথা অনেকবার প্রবুর কাছে শুনেছি।

কথা শেষ করে আবার তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

স্মৃতীশের মনে হল, সে এক নতুন জগতে এসেছে। এ জগতের সাথে তার চাক্ষুষ পরিচয় কখনও ঘটেনি। বাস্তব জ্ঞান তো দূরের কথা। মানুষের কঙ্কাল যেন ভীড় করে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সভয়ে শক্ত হয়ে বসল।

লতু এসে পাশে দাঁড়াল। ছোট ছেলে নোদা দাঁড়াল পেছনে। সবার দৃষ্টি স্মৃতীশের ওপর, আর স্মৃতীশের দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে প্রবীরের কাকিমার মুখের ওপর। স্মৃতীশ ভাবছিল। ভাবছিল, এই মা। ম্যাডোনা নয় অজন্তার গুহাচিত্র নয়, হরপ্পার মাতৃপ্রতীক নয়। বিগত জীবনের রূপ রস হারিয়ে মায়ের আসল চিত্র যেন ফুটে উঠেছে ঐ জীর্ণ শীর্ণ মহিলার অবয়বে। ঐ অবয়বে আঁকা রয়েছে ক্ষতবিক্ষত জীবনের রেখা। এমনি যারা তারও মা, এ মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ দেহে নয়, করুণা মিশ্রিত চাহনিতে, স্নেহসিক্ত ওষ্ঠাধারে। স্মৃতীশ স্তম্ভিতের মত চেয়ে রইল।

প্রবীর ডাকল, কি ভাবছ স্মৃতীশ?

না কিছু নয়। কণ্ঠস্বর যেন তন্দ্রালু। ঘুমের ঘোর যেন কাটেনি।

বাইরে জুতার শব্দ শোনা গেল। সে ঘরে আসতেই প্রবীর মুখ তুলে বলল, বুলু এসেছে। বুলু আমার বোন। এবার বুলুও ম্যাট্রিক দেবে।

ধপাস করে বইগুলো ফেলে দিয়ে বুলু কোন রকমে নমস্কার করল। দ্বিধাহীন ভাবে বলল, আপনার কথা দাদার কাছে রোজই শুনি। যাক শেষ অবধি এসেছেন।

স্মৃতীশ হাসল। বলল, এর আগে প্রবীর আসতে বলেনি কখনও।

তা বটে। বাবা আপনাকে দেখতে চেয়েছিলেন, দাদা বললেন রাজবাড়ির লোক। তাই ভাবলাম, আসবেন না বোধহয়। রাজা রাজড়ার ব্যাপার।

বুলুর উদ্দেশ্যবিহীন মন্তব্য স্মৃতীশের মনে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিঁধল। উত্তর দেবার আগেই কে যেন তার জিব টেনে ধরল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গ্রামের আদব কায়দায় এমন সপ্রতিভ ভাব কখনও সে দেখেনি। শ্যামলী আর শেফালি হয়ত বাইরের লোক দেখলে পালিয়ে যেত। এমন সরল সহজ গতিতে হাত তুলে নমস্কার করা তাদের পক্ষে কল্পনাতীত। নিজেও সে পারত না। মেয়ের সাথে বিনা দ্বিধায় আলাপ আলোচনা করার মত মনের গঠন তার নয়। বুলুকে জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজতে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেল। রাজবাড়ির খোঁচাটা আরও শক্ত করে দিল তার জিহ্বা ও বাচন প্রচেষ্টাকে। তারা হয়ত জানে না, রাজবাড়ির নফর আর অন্নদাস এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান অতি ক্ষীণ। তবুও শক্তি সংগ্রহ করে বলল, রাজা রাজড়ার আমি কেউ নই, আমি অনুগৃহীত অন্নদাস মাত্র।

শেষের শব্দ দুটির সঙ্গে তার মনের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ফেটে পড়ল। এ বেদনার আঘাত তার মুখের রক্ত শুষে নিল, সে বুলু নয়, সে প্রবীর। প্রবীরের ইচ্ছা হচ্ছিল, বুলুর গালে কসে একটা চড় দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, কথা বলবার সময় মাত্রা না রাখাটা অপরাধ। সমগ্র ঘরখানা কেমন যেন অসহনীয় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে।

প্রবীর কথান্তরে যাবার চেষ্টায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, বুলু আমার সাথেই পরীক্ষা দিত। নেহাত বয়স কম হওয়াতে আটকে গিয়েছিল।

যাকে লক্ষ্য করে প্রবীর কথার অবতারনা করল তার দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। প্রবীরের অত গুলো কথার পরেও স্মৃতীশ কোন

উচ্চবাচ্য না করায় বুলুও অপ্রতিভ বোধ করছিল। কাপড় বদলে আসার অজুহাতে সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রবীর বলল, কাকা আসছেন।

স্মৃতীশ ভাল হয়ে বসল।

প্রবীরের কাকা দাশুবাবু ঘরে প্রবেশ করতেই স্মৃতীশ উঠে প্রণাম করল।

প্রবীর বলল, এই আমার কাকা, আর এই হল স্মৃতীশ।

স্মৃতীশ মুখ উঁচু করে একবার এই প্রৌঢ় মানুষটির চেহারা ভাল করে দেখে নিল। মনে হল, জরাজীর্ণ দেহের সাথে সংসারের হাজারো চিন্তা জড়িয়ে চোখের কোলে কালির প্রলেপ টেনে দিয়েছে। আসল মানুষের রূপ ঢাকা পড়ে গেছে চিন্তাক্লিষ্ট কপালের রেখায়। কাঠামোটা শুধু রয়েছে, আসল মানুষটি বোধহয় আর নেই।

স্মৃতীশ অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দাশুবাবু একখানা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে এসে বসল। আরম্ভ হল গ্রামের কথা, স্কুলের কথা, মাস্টার মশাইদের কথা। অতি লঘু অথচ তরুণ মনের উপযোগী আলোচনা শেষ করে স্মৃতীশ বিদায় নিল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বালা হয়েছে, দোকানে দোকানে ঝল-মল করছে আলোর সারি। দলের পর দল মানুষ ছুটছে সামনে স্টেশনের দিকে। শহরের কাজ শেষ করে পল্লীর গৃহে ওরা ফিরে চলেছে। স্মৃতীশ ফিরছে নিজের আস্তানায়। গ্রামের রোদ আলো বাতাসে মুক্ত বিহঙ্গমের মত সে বড় হয়েছে। সভ্যতার আদব কায়দা হয়ত সে জানে না, তবুও মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস ফেলবার মত পরিবেশ সে পেয়েছে। সে পরিবেশে আন্তরিকতা রয়েছে। গ্রাম্য পরিবেশে শহুরে কায়দায় এক বাটি চায়ের আমন্ত্রণে প্রীতিকে তরল করে তোলা হয় না, সেখানে হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ফলারের নেমতন্নে। মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করতে কত বেশি লাঞ্ছনা সহ্য করে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কয়েক মাসের নফর-জীবনে। সে বুঝেছে, এই জীবনের গৌরবে মানুষ দুরের মানুষকে অবজ্ঞা করেছে। এই জীবনের মানদণ্ড অর্থ। মানুষের যোগ্যতা এখানে অবান্তর। যারা সঞ্চয় বা সংগ্রহ করেছে অর্থ তারা ঐ রাজার দোসর। যাদের নেই তারা দাশুবাবু অথবা ততাধিক কেউ।

মানদণ্ডের নিষ্ঠুর ব্যাভিচারে না-থাকার দলের রয়েছে শুধু প্রাণের স্পন্দন, বঞ্চনা তাদের প্রাপ্য, এই প্রাপ্তি তাদের কঠোর করে তুলেছে কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গী যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই মৌনতা বোধহয় ভিসুভিয়াসের মৌনতা।

কয়েক মাসের জীবন তার সতের বছরের জানাকে হার মানিয়েছে। ব্যস্ততা নেই, ধীরে অতি সন্তর্পনে অভিজ্ঞতার রাজ্যে সে পা দিচ্ছে। এই বুঝি হবে তার জীবন যাত্রায় পাথেয়।

নিজের বাসস্থানে ফিরে এসে শুয়ে রইল আলো নিবিয়ে।

রামদীন বাহির থেকে ডাকল।

স্মৃতীশ উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর রামদীন।

অনেক দিন মোলাকত হয়নি, তাই আসলাম।

স্মৃতীশ তাকে বসতে দিয়ে আবেগের সাথে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছেলে নেই রামদীন ?

ছেলে! আছে বাবুজী। অনেক উমর। তোমার মত আমার আছে নাতি।

তুমি তাদের কাছে যাও না।

সেদিন যে বললাম, এই আমার মুলুক। এ মুলুক ছেড়ে যেতে পারি না।

তাদের জন্য মন খারাপ হয় না ?

রামদীন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে তামাক পাতায় চুন মিশিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হাতের তেলোয় ডলতে লাগল। তার মন তখন বিহারের কোন পল্লীর ভগ্ন কুটিরের আনাচে কানাচে হয়ত ঘুরছিল। তন্ময় হয়ে সে হয়ত ভাবছিল তার চলে যাওয়া ফালগুনী রাতের কথা, সোনালী জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাসপূর্ণ দিনগুলো।

কি ভাবছ রামদীন ?

খোকাবাবু, দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই। দিল যা চায়, তাতো লেকিন কেউ পায় না আমিও পাইনি। বিশ সাল আগেই সব মিটে গেছে খোকাবাবু। ববুয়াকো মাকে কাশিমপুরের শশ্মানে দিয়ে এসে অবধি আর মন খারাপ করিনি।

রামদীন থেমে গেল।

থামলে কেন ?

থাক বাবুজি। দুখকে বড় করে না দেখাই ভাল। রামরতিয়া মরল, ছেলেরাও বাপকে ছেড়ে চলে গেল। তাই মন খারাপ আর হয় না। ববুয়া বলল, তুমিও চল আমাদের সাথে। যেতে পারলাম না।

স্মৃতীশ সব কথা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। রামদীন চুপ করতেই সেও চুপ করে বসে রইল।

রামদীন উঠতে উঠতে বলল, পূজায় দেশে যাবেন না ?

যাব।

রামদীন আর দাঁড়াল না। স্মৃতীশ আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

খেয়ে এসে বই নিয়ে বসল। রোজকার পড়া তৈরী না করে তার ঘুম আসে না। রাজবাড়ির দেউড়িতে বারটার ঘণ্টা বাজল। সে দিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই বইয়ের রাজ্যে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

বাধা পড়ল।

গভীর রাতে জুমন চুপি চুপি এসে দাঁড়ল দোর গোড়ায়। তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে তুমি কেন ?

নিদ আসছিল না, তাই বাতাসে বের হয়েছি।

দেউড়িতে রাত একটার ঘণ্টা বাজল।

জুমন জিজ্ঞাসা করল, এত রাত জেগে তুমি পড়।

হাঁ।

বই গুটিয়ে রাখল। এই লোকটাকে কেন বা তার ভাল লাগেনি। জুমনের সাথে দেখা হলেই সে পাশ কাটাতে চেষ্টা করত। মুখ ফুটে কিছু না বললেও হাবভাবে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করত তার অপ্রীতিকর মনোভাব।

জুমন চৌকাঠে বসল।

আজকের খবর শুনেছ খোকাবাবু ?

কোন খবর ?

এ খবর রাজবাড়ির খবর। বলে কালো কালো দাঁত বের করে জুমন হাসল। এই ক্রুর হাসির ইঙ্গিত সে জানে না, সংবাদ শুনবার আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমাদের নেত্যকালীর কথা বলছিলাম। বছর খানেক এসেছে।

হুজুরের পা ধরে কেঁদে কেটে রাজবাড়িতে থেকে গেল। বিধবা অনাথ। তুই কিনা সব মজালি।

ক্ষিপ্তের মত স্মৃতীশ চিৎকার করে উঠল, বলল, তোমার এসব নোংরা কথা আমি শুনতে চাইনা।

বিশ বছর রাজবাড়ীতে থেকে জুমনের মাথার চুল সাদা হয়েছে। আজ অবধি মহারাজা মহারাণী আর দেওয়ান-নায়েব ছাড়া কেউ কোনদিন এত জোর দিয়ে তাকে ধমক দিতে সাহস পায়নি। আর রাজবাড়ির অন্নদাস একটা পুঁচকে ছোঁড়া তাকে চোখ রাঙাবে, এ তার পক্ষে অসহ্য। জুমন ঘাবড়ে গেলেও তার হিংস্র চাহনি যেন স্মৃতীশকে গ্রাস করতে ছুটে আসছিল। কোন কথা না বলে জুমন নীরবে উঠে গেল।

দুদিন পর মহারাজার পরোয়ানা নিয়ে রতিকান্ত এসে জানাল, স্মৃতীশের স্থান ত্যাগের আদেশ হয়েছে। দক্ষিণ কোনায় একটি ঘর তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেন যে এই আদেশ তা বলা হয় নি, স্মৃতীশও জানবার আগ্রহ দেখায় নি। নীরবে এই অবমাননা পকেটস্থ করে বিছানা বই নিয়ে নতুন কামরায় এসে উঠল।

রতিকান্ত যাবার বেলায় বলে গেল, খোকা, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, সাবধান হয়ে চলতে হয়।

স্মৃতীশ উপদেশটুকু শুনে নিল, উত্তর দিল না।

রাতের বেলায় সব ঘটনা প্যারীমোহনকে জানান মাত্র প্যারীমোহন হাসল।

বলল, ভাল হয়েছে। আজ জুমন নালিশ করেছে তার বউকে দেখে শিস্ দিয়েছ, কাল হয়ত আরও গুরুতর কিছু বলত। জুমন বেটা অতি শয়তান। ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। রাজরাজড়ার ঘরে শয়তান দুষমন নিয়ে বাস করতে হয়।

গড়িয়ে গড়িয়ে দুইটি বৎসর পেরিয়ে গেল। দুই বৎসরে কত ঘটনা ঘটে গেছে। যাই ঘটুক না কেন তার পাঠের সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। বছর খানেক আগে প্রবীর খবর দিয়েছিল, বুলু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। সংবাদ দিয়ে প্রবীর হয়ত আশা করেছিল আনন্দের আতিশয্যে স্মৃতীশ

অভিনন্দন জানাতে ছুটবে কিন্তু মৌখিক তৃপ্তিসূচক দু চারটি কথা ভিন্ন স্বতীশ বিশেষ কিছু না বলাতে প্রবীর মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। জ্ঞাতসারে স্বতীশ আঘাত দিতে চায় নি। অজ্ঞাতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। বুলুর পাশে শ্যামলী আর শেফালিকে দাঁড় করিয়ে নিজে নিজেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। লেখাপড়া শেখাবার সামান্য সুযোগ থেকে শ্যামলী ও শেফালী বঞ্চিত অথচ আর্থিক অনটনের মাঝেও দাশুবাবু ক্লান্তিহীন সহায়তা করছে কন্যার ভবিষ্যত গঠন করে দিতে। মানুষের অসম জীবনের এই ব্যঙ্গ স্বতীশ মোটেই সহ্য করতে পারে নি। বুলুর পাশের সংবাদের সাথে নিজেদের অক্ষমতার চিন্তা বেদনা সৃষ্টি করেছিল। মুখ ফুটে তা বলতে পারে নি।

প্রবীর মাঝে মাঝে বলত, আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু মাত্র ঘরকন্নার উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলবার শিক্ষা পায়, কিন্তু সে শেখাও এত বেশি অসম্পূর্ণ যে শতকরা একটি ক্ষেত্রেও তারা বাস্তব সাফল্য লাভ করে না। ফলে মেয়েরা শুধু ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়। তাদের একটা জীবন আছে, তাদেরও একটা পৃথক সত্ত্বা আছে, তারাও যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, এ চিন্তা ধারা আমরা স্বীকার করি না। অস্বীকার করেই আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করি, এমন কি যারা মেয়েদের সত্যকার নারীজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের বাধা দেই, ব্যঙ্গ করি। সুমাতা পাবার তাগিদেও সুশিক্ষার প্রয়োজন, এই চিরাচরিত সামাজিক ধর্মও আমরা ভুলে গেছি।

স্বতীশ ওসব নীতিকথার চেয়ে অর্থনৈতিক কারণটা বেশি বড় করে দেখেছে। আজ যদি তার মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকত, তাহলে সামান্য কর্মসংস্থান তার পক্ষে অসম্ভব হত না। আজ হয়ত তাকে ধনীর গৃহে অন্নদাস হয়ে ভাগ্যের সাথে যুঝতে হত না। শেফালী ও শ্যামলীর যদি কোন দিন দুর্ভাগ্য আসে, সে দুর্ভাগ্যকে তারা ভগবানের দান বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে। নিরুপায়ের মত অপরের অনুকম্পা ভিক্ষা করতে হবে। আত্মরক্ষার উপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করবার মত শিক্ষা দেবার অক্ষমতা অথবা অজ্ঞতা এই অসহায় মানুষদের আরও অসহায় হবার পথ খুলে দেয়।

একবার মনে হয়েছিল নিজে গিয়ে বুলুর সাথে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে আসবে। তারপর ভেবেছে প্রবীরের মারফত কয়েকখানা বই কিনে পাঠিয়ে দেবে, কার্যকালে কিছুই করতে পারেনি। শুধুমাত্র মৌখিক উল্লাস

জানিয়েছে। যেটুকু করা সহজ এবং যা না করলেই নয়, সেইটুকু সে করেছে।

দুই বছরেও তার বন্ধু জোটেনি। প্রবীর ও প্যারীমোহনকে বাদ দিলে রামদীন একমাত্র তার নিকট সঙ্গী।

জুমনকে বিকেল বেলায় ব্রহামের আরবী ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে বেড়াতে যেতে দেখত। জুমন তাকে দেখলে হাসত। এ হাসিতে জয়ের তৃপ্তি পরিস্ফুট হলেও লক্ষ্য বস্তুর কোন বিকার ঘটত না।

রামদীন মাঝে মাঝে এসে বসত। গল্পে গল্পে ভুলেই যেত যে রামদীন রাজবাড়ির সহিস। তার মনে হত বিহারের কোন গ্রাম্য পরিবেশে রামদীনের হাত ধরে সে বেড়াতে বের হয়েছে।

রামদীনও তাকে ভাল বাসত সকল সত্ত্বা দিয়ে। কয়েক মাস আগে রামদীন একজোড়া ফজলী আম হাতে করে তার সামনে রেখে বলল, আপনি খাবেন খোকাবাবু।

স্মৃতীশ হাসতে হাসতে বলেছিল, এইতো দেশ থেকে এলাম। সেখানে কত আম খেয়েছি জানো? —এ আম তুমিই খেও।

ব্যথিত কণ্ঠে রামদীন বলল, আমি খাব!

তাইতো বলছি।

রামদীন জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে ফেলল।

স্মৃতীশ আবেগের সাথে জিজ্ঞাসা করল—রামদীন তুমি কাঁদছ কেন?

রামদীন তার ময়লা গামছা দিয়ে চোখ মুছে নীরবে স্থান ত্যাগ করল। মানুষের হৃদয় চেনবার অক্ষমতা অপরকে আঘাত দেবার সুযোগ দেয়। কৃতকর্মের জন্য স্মৃতীশ অনুতপ্ত হল। সে বুঝল রামদীনের হৃদয় নামক বস্তুর কোন দুর্ব্বল অংশে সে একটি মনোরম স্থান অধিকার করে রেখেছে। তার নিশ্চুপ অভিব্যক্তি বিহীন স্নেহের অঙ্গনে স্মৃতীশ যেন একটি পারিজাতগুচ্ছ। স্মৃতীশ ক্ষিপ্তের মত অসঙ্গত আবেগে একটা আম তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরল। অতিশয় পরিতৃপ্তির সাথে দাতার স্নেহের অশ্রুকে সম্মান জানাল।

রামদীন আবার এসেছে। তার স্নেহের দান মাথায় পেতে নিতে হয়েছে। স্মৃতীশ কখনও প্রতিবাদ জানায়নি, সহাস্যে পলিতকেশ বৃদ্ধকে আপ্যায়িত

করেছে। রাজবাড়ির যান্ত্রিক জীবনের তলায় কারও কারও হৃদয়বৃত্তি যে বিচ্ছুরিত হয় তার প্রমান সে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে ভেবেছে, এই রাজবাড়ির সাথে অতি পরিচয়ের মাঝ দিয়ে অতি অপরিচিত হয়ে রয়েছে সে নিজেই। ঐশ্বর্যের তলায় মানুষের কত অস্ফুট ক্রন্দন যেন সে শুনতে পেয়েছে, তাই পরিচিত হবার আকাঙ্খাও তার জাগেনি। তার সূত্রও সে খোঁজেনি।

মাঝে মাঝে দেউড়ীর দারোয়ান তিন্তিরি সিং-এর সাথেও দেখা হয়েছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটুকু মনে করে সে তার সাথে আলাপ জমাবার সাহস পায়নি। তিন্তিরি সিং-এর মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত শশ্রুগুম্ফের তলায় কেমন একটা হিংস্র হাসি সে দেখতে পেত। মনে হত, প্রথম দিনের মত আবার যদি বলে, ভিখ্ নেহি মিলেগা, তা হলে ধৈর্যধারণ হয়ত সম্ভব হবে না।

তিন্তিরি সিংও বিবেকহীন নয়। স্মৃতীশকে দেখলেই না-দেখার ভান করে কোন হিন্দী কেতাবে মনঃসংযোগ করত। লজ্জা কিম্বা ভয়ে তা বোঝা যেত না কিন্তু স্মৃতীশকে এড়িয়ে চলত।

জুমনের দর্মার ঝাঁপের সামনে বহুবার রাজকুমারকে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখেছে। প্রথম দিন সে অপরিচিত ছিল, আজ আর সে অপরিচিত নয়। তাকে দেখলেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা তার মনকে বিব্রত করে তুলত। অতি সাবধানতার সাথে শত হস্তের দূরত্ব রক্ষা করত।

প্যারীমোহন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, মহারাজকুমারের সাথে তোমার দেখা হয়।

হয়, তবে না হওয়ারই মত।

প্যারীমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, তাই ভাল। দূরে থাকাই ভাল। রাজদর্শন কোন যুগে সৌভাগ্য মনে করা হত। বর্তমান যুগে বিষহীন সর্পের তুল্য রাজাদের কুলপনা চক্র দেখেই বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ওরা না পারে এমন কাজ নেই।

অনেকক্ষণ থেমে থেকে আবার বলেছিল, ওদের তিনটে সেলাম দিও। ওরা যখন দূরে থাকবে তখন একটা, কাছে এলে একটা আর চলে গেলে একটা। তারপর গঙ্গা স্নান করবে, বুঝলে।

রাজবাড়ির অতি বশম্বদ কর্মচারীর মুখে রাজস্তোত্র শুনে স্মৃতীশ অবাক গিয়েছিল। কোন মন্তব্য করতে সাহস পায়নি।

দু বছর প্রায় কেটে গেছে।

পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। ব্যস্ততার সাথে কলেজ থেকে ফেরবার পথে জুমনের সাথে দেখা। পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। জুমন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খোকা বাবুর ছুটি হল।

হাঁ। বলে স্বতীশ পা ফেলতেই জুমন তার জামার পেছনটা চেপে ধরে বলল, আমি চলে যাচ্ছি খোকাবাবু।

স্বতীশ তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুভাবে ফিরে তাকাল।

আমার জবাব হয়ে গেছে।

এ যেন দুবছর আগের জুমন নয়। বেদনাহত মানুষের আর্তনাদের মত মনে হল জুমনের কণ্ঠস্বর।

জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ চাকরি গেল কেন?

ওসব লুংরা কথা খোকাবাবু। পরে শুনো।

জুমনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বতীশ সোজা এসে নিজের ঘরে বই খুলে বসল। জুমনের কর্মচ্যুতিতে সে খুশী হয়েছিল ঠিকই, তবুও মনের কোনায় অপরের কর্মহানির কাল্পনিক দুঃখ আঘাত দিচ্ছিল। কেন চাকরি গেল! রাজবাড়িতে কারুরই কি নিজস্ব কিছু নেই। মাত্র একজনের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই কি সবাইকে নির্ভর করতে হবে।

তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে জুমন সস্ত্রীক এসে দাঁড়াল তার ঘরের সামনে।

আমরা আজই চলে যাচ্ছি খোকাবাবু।

জুমন কেন যে তাকে তার যাবার সংবাদ পরিবেশন করতে এল তা সে ভেবেই পেল না। রাজবাড়িতে তার কথা শোনবার লোকের অভাবতো নেই। স্বতীশ ক্ষুন্নভাবে বলল, মহারাজাকে বললেই পার।

আর হয় না। তিরিশ বছর কাম করলাম। আজ বিনা আজুহাতে কাম গেল। ভালই হল। চাকরিতে ঘেন্না ধরে গেছে। বউ-বেটির ইজ্জত যদি না থাকল তা হলে সে চাকরিতে কি লাভ।

স্বতীশ জিজ্ঞাসা করল, এখন কোথায় যাবে।

দেশে যাব খোকাবাবু। সালার জানেন, বাপ দাদার ঘর সেখানে। নবাবী কেতায় বড় হয়েছিলাম, নেহাত নসীব খারাপ তাই গোলামি করি।

জুমন কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, গোস্তাকি কিছু হয়ে থাকে মাপ কর।

জুমন বউ-বেটির ইজ্জত রক্ষার দায়ে কর্মচ্যুতি মাথায় পেতে নিল। স্মৃতীশ আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, প্রায় দুবছর আগে বউবেটির ইজ্জত রক্ষার অজুহাতে স্মৃতীশকে স্থানচ্যুত হতে হয়েছে। চ্যুতি ঘটল দুজনেরই। কিন্তু কেন? উত্তর খুঁজে না পেয়ে প্যারীমোহনের কাছে এসে বসল। জুমনের কর্মচ্যুতির কথা বলতেই প্যারীমোহন গম্ভীর ভাবে বলল, এটা ফেব্রুয়ারী মাস নয় কি? —এই মাসেই তোমার পরীক্ষা। আগামী জুলাই মাসে তুমি বি-এ ক্লাশে পড়বে?

স্মৃতীশ যা জিজ্ঞাসা করল, এ কথা তার উত্তর নয়। প্যারীমোহনের অদ্ভুত প্রশ্নে বিব্রত বোধ করতে লাগল।

অবাক হয়ে কি ভাবছ? আর দু বছর পরে তুমি জজ হতে পার ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পার। অনেক কিছুই হতে পার, নয় কি?

স্মৃতীশ হেসে বলল, আবার কেরাণীও হতে পারি।

যাই হও, সেদিন দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়াতে পা ফেলতে হবে। সেদিন বলতে পারবে না, আমার বয়স কম। অথচ দু বছরে এমন কিছু দায়িত্বশীলও হতে পারবে না। যেদিন দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে, সেদিন ওরকম জুমনদের সাথে হরবখত দেখা হবে। সেদিন বুঝবে পাপীর পাপ চিরকাল চাপা থাকে না। পাপ নিজের হীনতায় ব্যক্ত হবেই হবে। জুমন পাপী, পয়সা উপায় করবার হাজার হাজার পথ থাকতে সে বেছে নিয়েছিল সব চেয়ে নোংরা পথকে। অল্পবয়স্কা তৃতীয় পক্ষের নিকে করা বউকে মূলধন করে রাজত্ব লাভ করবে এই বোধহয় তার বিশ্বাস ছিল। তাই তাকে যেতে হয়েছে। বয়স বাড়বে আরও শিখবে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। পড়াশোনায় মন দাও।

পরীক্ষার শেষ দিনে মনে মনে হিসাব করে নিল সামনের তিনটে মাস সে কি করে কাটাবে। ফিরিস্তি করল, কোথায় কোথায় যেতে হবে। শান্তির সাথে অবশ্যই দেখা করতে হবে। তার বিয়ের পর একবার মাত্র দেখা হয়েছে, মাঝে মাঝে তার চিঠি পেয়েছে। সে চিঠিও কোন আনন্দ সংবাদ বহন করে আনেনি। নেহাত মামুলি সংবাদের সাথে খোকার অসুখ, নয়ত নিজের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছে।

বিছানাপত্র বই কেতাব বেঁধে প্রবীরের সাথে দেখা করবার ইচ্ছা নিয়ে বাগানে কেবলমাত্র পা দিয়েছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে রতিকান্ত এসে দাঁড়াল।

হুজুর তোমায় ডাকছেন। বলেই রতিকান্ত উত্তরের কোন প্রত্যাশা না করেই বলল, এস।

আমার যে অনেক কাজ রয়েছে। আজই বাড়ি যাব, যাবার সময় মহারাজাকে প্রণাম করে যাব।

যে পুরীতে রাজ অনুগ্রহ পাবার জন্য পরস্পরের বৈরিতা সৃষ্টি হয়, সেই পুরীতে বাস করে কোন অন্নদাস যে মহারাজার আদেশ পালনে দ্বিধা বোধ করে, একথা রতিকান্ত স্বপ্নেও ভাবেনি। স্মৃতীশের কথায় রতিকান্ত আশ্চর্যান্বিত হল এবং অবমানিত বোধ করল, সে ধমকে উঠে বলল, হুজুরের হুকুম এখনই দেখা করতে হবে।

কঠোর এবং গুরুতর কয়েকটি কথা স্মৃতীশের ঠোঁটের কাছে এসেও থেমে গেল। মালিকের খাস বেয়ারাকে কটু কথা বলার চেয়ে স্বয়ং মালিকের সাথে দেখা করে সব কথা বলা যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে যেখানে দেখা করবার সুযোগ আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

স্মৃতীশ রতিকান্তের পিছু পিছু দরবার ঘরে এসে দাঁড়াল।

মহারাজা বললেন, তোমার অপেক্ষায় বসে রয়েছি।

যথারীতি প্রণাম করে স্মৃতীশ বলল, রতিকান্ত বলল, মহারাজার হুকুম এখনি যেতে হবে।

মহারাজা হাসলেন।

বললেন, আমার মত মহারাজা যদি হতে তা হলে ও সব ভাড়াটিয়া নফরদের শক্তি বুঝতে পারতে। ওরা ডাকতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। ওদের কাছে মানুষের ক্ষমতা হল টাকা, যদি চাকচিক্য বেশি থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তুমি দুঃখ কর না, রাগও কর না। রাজবাড়িতে সব পাবে, পাবে না শুধু প্রাণের আকর্ষণ। বুঝলে!

স্মৃতীশ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাণী তীর্থে যাবেন। তোমার তো পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমার ইচ্ছে তুমি তাঁর সাথে বেড়িয়ে এস।

স্মৃতীশের সব প্ল্যান এক মুহূর্তে ভেস্তে গেল। চিন্তিত ভাবে বলল, কিন্তু।

কিন্তু অনেক রইবে জীবনে, সুযোগ অনেক রইবে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। অনেক দেখবে, অনেক জানবে, অনেক শিখবে।

মায়ের সাথে দেখা না করে কোথাও যেতে পারব না।

স্মৃতীশের দৃঢ় অথচ স্পষ্ট কথায় মহারাজা ক্ষুন্ন হল না। বরং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে মহারাজা হাসল। এ হাসির সাথে স্মৃতীশের কোন পরিচয় নেই। এ হাসির তলায় যে বেদনা লুক্কায়িত ছিল তা বুঝবার সামর্থ্য স্মৃতীশের ছিল না।

বেশ। মায়ের সাথে দেখা করে সাতদিনের মধ্যেই ফিরে এস। এদিকেও জোগাড় যন্তর করে নিতে হবে তো।

স্মৃতীশ সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ তাকে স্টেশনে পৌঁছাতে মহারাজার ব্রুহাম বেরিয়ে এল। পথ খরচের টাকা রাজকোষ থেকে দেওয়া হল।

প্যারীমোহনের সাথে দেখা করে সব কথা বলতেই প্যারীমোহন উদ্বিগ্নভাবে বলল, কথা না দিলেই পারতে। যা হবার তা হবেই। তবে মনে রেখ, তোমার আর মহারাজার পার্থক্য যতটুকু, সেইটুকু বজায় রেখে চলবে। সাফল্য, সহানুভূতি, করুণা অথবা প্রলোভনে নিজেকে হারিয়ে ফেল না।

ব্রুহাম চেপে সোজা এসে উঠল প্রবীরের বাসায়। এই তার দ্বিতীয় বার আগমন। জিনিষ পত্র নামিয়ে নিয়ে কোচয়ানকে ফিরে যেতে বলল।

ব্রুহামের আওয়াজে প্রবীর এসে দরজায় দাড়িয়েছিল। স্মৃতীশকে লট-বহর নিয়ে নামতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

তুমি বুঝি বাড়ি যাচ্ছ?

হাঁ, কিছু কেনা কাটা করতে হবে। স্কলারশিপের টাকা জমা হয়েছে, ছোট বোনদের আর মায়ের ক'খানা কাপড় কিনে নিয়ে যাব।

এ বেলা না হয় নাই বা গেলে। রাতের গাড়িতে যেও। আমি তোমাকে তুলে দিয়ে আসব।

সামান্য অসম্মতি জানিয়েও স্মৃতীশ রাজি হল।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল বাজার করতে। বাজার করে ফিরে, এসে দেখল বুলু তার বিছনাপত্র খুলে তছনছ করে ফেলেছে।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, কি হচ্ছে বুলু ?

দেখছি।

কি দেখছে তা বুলু গুছিয়ে বলতে পারল না। অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

স্বতীশও বুলুর এই কাজের কোন হদিস করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বুলুর এই অপ্রতিভ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রবীর বিশেষ কৌতুক অনুভব করল। বুলু হয়ত মনে মনে এই অনধিকার কার্যের সমর্থনে কৈফিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একটা নিস্তব্ধতা হাস্য কলরোল মুখরিত পরিবেশকে ভাব গম্ভীর করে তুলেছিল, সে গাম্ভীর্যকে স্বতীশ সহ্য করতে না পেরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, হাসলে যে ?

হাসির বেগ সামলে স্বতীশ জবাব দিল, এমনি।

স্বতীশ এমনি বলে অবস্থাকে লঘু করবার চেষ্টা করলেও বুলুর কর্ণমূল পর্যন্ত রঙীন আভা ছড়িয়ে পড়ল। অসহনীয় উত্তাপে সে ছিন্ন জ্যা ধনুকের মত ছিটকে পাশের ঘরে প্রবেশ করে হাঁফ ছাড়ল।

৬

শেয়ালদহ স্টেশনে আসবার পথে প্রবীর বলল, এবার এসে রাজবাড়ির আস্তানা ছেড়ে দিও।

স্বতীশ হাসল, বলল, কিন্তু থাকবার মত আস্তানা পাব কোথায়?

এবারও যদি স্কলারশিপ পাও তাহলে ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ পাবে। স্কলারশিপের টাকাতো বেঁচেই যাবে।

পেলে তবে তো।

তুমি পাবেই।

আর তুমি?

আমার কথা বাদ দাও। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।

নিজের বেলায় বেশ টন্‌টনে জ্ঞান রয়েছে, অপরের বেলায় চোখ বুঁজে থাক, এই তো।

প্রবীর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে নীরবে চলতে লাগল।

স্টেশনে গাড়িতে বসে স্বতীশ বলল, যদি আর আমাদের দেখা না হয়।

আশ্চর্য হব না। ধরা বাঁধা জীবন তো কল্পনার বস্তু। ছেদ হল স্বাভাবিক। তবুও আশা করব।

আশা! তাই নিয়েই তো বেঁচে রয়েছে সবাই।

গাড়ি ছুটছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে দূরপাল্লার গাড়ির গতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাড়ির গতির চেয়ে স্বতীশের মনের গতি আরও বেগে ছুটছে।

মা বোধহয় বসে বসে ভাবছে। সময়মত না পৌঁছাবার দরুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে, হয়ত নিদ্রাহীন রজনীর ক্লান্তিতে দাওয়াতে গা এলিয়ে দিয়েছে। এই শীতের রাতে আঁচল পেতে শুয়ে শুয়ে হয়ত রাত কেটে যাবে। কেমন অব্যক্ত বেদনা অনুভব করল স্বতীশ।

এক্সপ্রেস গাড়ির দুরন্ত বেগ, শোঁ শোঁ করে বাতাসের বুক কেটে ছুটে চলেছে। ছোট ছোট স্টেশনের বাতিগুলো জোনাকির আলোর মত ছিটকে চলে যাচ্ছে চোখের সম্মুখ থেকে। বড় বড় দু একটা স্টেশনে মাঝে মাঝে গাড়ি

দাঁড়াচ্ছে। ফেরীওয়ালার অক্লান্ত চিৎকারে যাত্রীর দল জেগে উঠেছে, ঝিমুনি ছুটে যাচ্ছে। হাত পা গুটিয়ে যারা বসে বসে ঘুমোচ্ছিল তারা গরম চা পাবার আশায় উঠে বসে। চিৎকার কোলাহলে ঘুমন্ত গাড়িখানা সজাগ হয়ে উঠে। আবার চলতে থাকে গাড়ি। স্মৃতীশের চিন্তা মাঝে মাঝে বাধা পায়। তার মন একবার উত্তরে ছুটছে হরিশপুরের স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশে, আবার দক্ষিণে ছুটছে বিগত দুই বৎসরের রাজবাড়ির জীবনের দিকে। জুমন, রামদীন, রাজকুমার, প্যারীমোহন সবই ভিড় করে যেন নিজেদের কথা বলতে চাইছে।

ঝিমুনি এসে গেছে।

রাতেরও শেষ।

রাতের পোর্টার হাতে ঝোলানো বাতি নাড়তে নাড়তে গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করতে থাকে, নন্ পু-র-র। তন্দ্রাচ্ছন্ন স্মৃতীশ ধড়মড়িয়ে উঠে বিছানাপত্র নিয়ে নেমে পড়ল।

শীতের রাত, নইলে সকালের আলো এতক্ষণ দেখা যেত। ফাঁকা প্লাটফরম। দু চারজন যাত্রী আর পোর্টার। দূরে ওভার ব্রীজের তলায় মোটা গরম কোট গায়ে দিয়ে ছোট ঠেলা ট্রলির ওপর বসে পাহারাওয়ালা পুলিশ ঝিমুচ্ছে। কেরোসিনের মিটমিটে বাতির কালো ধুঁয়ো অন্ধকারকে আরও গভীর এবং ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ভারী হিমেল বাতাসে কান আর নাকের ডগা চিন্‌চিন্ করে উঠছে। লাল কাঁকর বিছানো প্লাটফরমের এক কোণায় একগোছা সবুজ ঘাস, ঘাসের বুকে কেরোসিনের বাতি মাঝে মাঝে মিটমিটে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেখানে একজোড়া কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সহকারী স্টেশন মাষ্টারের গলা শোনা গেল, রামভরছ, ঘোণ্টি লগাও। আপ লাইন ক্লিয়ার দেও।

ছোট্ট লোহার টুকরোর গায়ে হাতুড়ির ঘা পড়ল, যাত্রীরা সতর্ক হতে না হতেই গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে গেল।

সামনে চায়ের দোকান।

স্মৃতীশ জিজ্ঞাসা করল, হবে এক-আধ কাপ।

ঘুমন্ত ছোকরা চাকর ট্রেনের ঘণ্টা শুনে উঠে বসেছিল। খরিদ্দার কাউকে না দেখে আবার কাঁথা মুড়ি দেবার জোগাড় করে টেবিলের উপর সবেমাত্র

উঠে বসেছে। খোলা মাঠের কনকনে বাতাসে গরম জল সরবরাহ করবার দায়িত্ব তার। কষ্টকর অথচ রুচিকর। খরিদ্দার পেয়ে গরম কাঁথার স্নেহ-স্পর্শকে উপেক্ষা করেই নেমে এল।

গরম চা-এ চুমুক দিতে দিতে স্মৃতীশের কত কথাই না মনে হয়। এমনি ধারা শীতের রাতে চুপি চুপি খেজুরের রস চুরি করতে কতদিন না সে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বাইরে রাত কাটিয়েছে। এমনি ধারা কত রাতেই না আখের ক্ষেতে আখ চুরি করতে গেছে। কতদিনই বা, মাত্র দু বছর আগে। আজও সবই স্পষ্ট মনে পড়ছে।

সকালের আলো ফুটতেই স্মৃতীশ উঠে পড়ল।

শিশির ভেজা গ্রাম্য পথ বেয়ে যখন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল, তখন সুখদা নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে সবে মাত্র মুখে চোখে জল দিচ্ছিল। পেছন থেকে স্মৃতীশ তাকে জাপটে ধরে ডাকল, মা আমি এসেছি।

সুখদার আকুল আগ্রহে ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেঁদে ফেলল। আনন্দের অভিব্যক্তি অশ্রুর মাধ্যমে প্রকাশ পেল।

মা তুমি কাঁদছ?

সুখদা চোখ মুছতে মুছতে বলল, না রে মায়ের চোখের জল ফেলা নিষেধ। মা কখনও কাঁদতে পারে! মায়ের চোখের জল সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। এ কান্না যে সুখের কান্না।

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সাতদিন পেরিয়ে গেলেও স্মৃতীশ কলিকাতা ফেরবার কোন চেষ্টাই করল না। সকাল বেলায় পাড়া টহল দিতে বের হত। দু বছর আগেও স্মৃতীশের ছিল কতগুলো অনুচর। তাদের কাজ ছিল দুষ্ট দমন করা। যার ফলে অনেকেই স্মৃতীশকে ভয় করে চলত। যারা একদিন তাকে ভয় করত, তারা যেন নতুন মানুষকে পেল স্মৃতীশের কার্যকলাপে। দু বছরের ব্যবধানে কিশোর কেমন করে প্রবীণ হতে পারে সে কথা ছিল চিন্তার অগম্য। সবে ওঠা গোঁফের তলায় দৃঢ়তা ব্যঞ্জক মুখশ্রীকে ভয় না করে অনেকেই ভক্তি করতে শিখল। রাস্তায় দেখা হলে যারা স্মৃতীশকে এড়িয়ে চলত, স্মৃতীশ তাদের কাছে ডেকে ঘর গেরস্তালির কথা জিজ্ঞাসা করছে। সবচেয়ে বড় ভক্ত হয়েছে লালমোহন বোরেগী। অতীতের কোন

একদিন স্বতীশ আর তার অনুচরদের লাঠির যন্ত্রনায় লালমোহন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ছিল। সেই লালমোহন হল সবচেয়ে বেশি অনুরাগী।

নয়নপুরের বাজারে লালমোহন তরকারি বিক্রি করত। সেদিন পথে স্বতীশের সাথে দেখা হতেই লালমোহন আত্মগোপনের চেষ্টা করছিল। বুঝতে পেরে স্বতীশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ লালু দা?

লালমোহনের বৈষ্ণবীর ঢঙ্ রয়েছে। সভয়ে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, গুরু যেমন রাখে।

আজকাল কাজ কর্ম করছ দেখছি। তোমার আশ্রম আছে না উঠে গেছে?

আশ্রম আর নেই খোকাবাবু। উঠিয়ে দিয়েছে। বলেই লালমোহন পাঁকাল মাছের মত পালিয়ে বাঁচল।

লালমোহনের আখড়া ছিল গুনাইগাছি গ্রামে। নয়নার ওপারে। সন্ধ্যা বেলায় খোল করতাল আর দোতারার আওয়াজ নয়নার এ পারে হরিশপুরেও শোনা যেত। স্বতীশ তার দলবল নিয়ে নয়নার কিনারায় বসে বসে নর-নারীর মিশ্রিত কণ্ঠস্বরের হরিনাম শুনত। যেদিন পড়াশোনার তাগাদা থাকত না সেদিন অনেক রাত অবধি এপারে বসে বসে সংকীর্ত্তনও শুনত।

কানে কানে খবর ছড়িয়ে পড়ে। একদিন শোনা গেল লালমোহন গরুর ব্যবসা করছে। তেবারিয়া হাটে অল্প দামে গরু কিনে কোলকাতায় কসাইদের কাছে চালান দিচ্ছে। খবরটা সত্যি কি না যাচাই করবার লোকের অভাব হল না। হর-হাটে লালমোহনেকে গো-হাটায় দেখা যেত। গাণিতিক নিয়মে লালমোহনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা প্রমান হতে দেরী হল না।

গাঁয়ের দশজন চেপে ধরল।

লালমোহন বলল, কৃষ্ণের জীব। বুড়ো গরু হালেরও নয় ঘরেরও নয়। যাবে তো কসাইখানায়। তার চেয়ে পিঁজরাপোলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নারায়ন মুখ তুলে দেখবেন। এ পুণ্যি তোমরাও করনা কেন?

কেউ তার কথা বিশ্বাস করল, কেউ করল না।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল লালমোহনের আখড়া বাড়িতে টিনের ছাউনি উঠেছে। মহলে মহলে ভাগ হয়েছে তার আশ্রম। বিগ্রহ রাধারাণীর গায়ে সোনার অলঙ্কারের প্রাচুর্য ঘটেছে। পাঁচ দশ গাঁয়ের বোষ্টম, বিশেষ করে

জোয়ান মোট্টুমীর ভিড় জমেছে আখড়ার আঙ্গিনায়। অনেক রাত অবধি নাম কীর্ত্তন হচ্ছে। যারা রাতে ফিরতে পারে না, তাদের জন্ত অতিথিশালা তৈরী হয়েছে। শিষ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিষ্যদের দলে শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানও দু চারজনকে দেখা যেত।

প্রতিবাসীরা চেপে ধরল লালমোহনকে।

গুরুর উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে লালমোহন উত্তর দিয়েছিল, জানতো হরিদাসকে প্রভু বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সে কথা কি তোমরা ভুলে গেছ।

লালমোহন এখন পাকা মোহান্ত। ধুতি ছেড়ে কৌপীন আর বহির্বাস পরিধান করে। মুখে হরিনাম, কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা, হাতে জপের থলে। খাস বৈষ্ণব। সন্ধ্যা বেলায় হরিনাম আরম্ভ হলে মাঝে মাঝে লালমোহনের ভাব সমাধি হয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে স্মৃতীশ তার দলবল নিয়ে মাঝে মাঝে আশ্রমের মালপোয়া পায়েস খেয়ে এসেছে। অনেক সময় বসে বসে কীর্ত্তন শুনেও এসেছে। কিন্তু আখড়াকে কেন্দ্র করে যে বিরাট ঘটনাগুলো গোপনে ঘটে যায় তার বিন্দুমাত্রও তারা জানত না। অন্তত তাদের কিশোর মনে কোন ছাপ দিত না।

যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন পড়ার চাপ বেশি হওয়াতে স্মৃতীশ আর বাইরে যেত না। কোন কোন দিন ফুটবল খেলার পর নয়নার জলে স্নান করে বাড়ি ফিরত। একদিন ফিরে আসতে দেরী হল। পথে দেখা হল সানকী-ভাঙ্গার কচুমিঞার সাথে। কচুমিঞা বড় জোতদার। স্মৃতীশ তাকে চেনে। তার সাথে অন্ধকারে তিলককাটা হরিমতীকে যেতে দেখে স্মৃতীশ তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘটনাটা বুঝতে দেরী হল না।

নিজেদের মধ্যেই আলাপ আলোচনা করে যা স্থির করল তার ফল ফলল কয়েকদিন বাদে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল সন্ধ্যাবেলায় কে বা কাহারা লালমোহনকে নদীর ঘাটে বেদম প্রহার করেছে। অবস্থা সঙ্কটজনক, লালমোহনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করল। আসামী চেনা যায়নি, অতএব মামলার কোন কিনারা হল না।

লালমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস তার গ্রামস্থ প্রতিবাসীরাই তাকে আক্রমন করেছিল। সেজন্ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বিপুল উদ্যমে আখড়ার

উন্নতিতে লেগে গেল। মতলব ছিল, গ্রামের লোককে তার হিম্মত বুঝিয়ে দেবে এবার।

শাঁখারী পাড়ার অমৃত স্মৃতীশের দলভুক্ত হলেও বয়সে সবার বড়। বিশেষ করে সে বিবাহিত। লালমোহনের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করে বলল, লালমোহন গরু আর মেয়ে মানুষ বিক্রির ব্যবসা ফেঁদেছে। লাঠিতে ওর শিক্ষা হয়নি। ওর আখড়ায় ঘুঘু না চরিয়ে আমরাও ছাড়ব না।

বিচার ও বিচারফল সময়ের অপেক্ষা করে না। একদিন শেষ রাতে গুনাইগাছির লালমোহন বোরেগীর আখড়া দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বেড় আগুনে অনেক বোষ্টম বোষ্টুমি ঝলসে গেল। লালমোহন অবশ্য প্রাণে বাঁচল। আগুন নেভাতে গিয়ে গ্রামবাসীরা বদ্ধ ঘর থেকে আধপোড়া সাহাদাত মোল্লা আর হরিমতীকে টেনে বের করবার পর কারুরই আর প্রশ্ন রইল না, লালমোহনের আখড়া এত জমজমাট কেন!

পুলিশ এল তদন্তে। তদন্তের পর লালমোহনকেই চালান দিল। লালমোহনের বাকী যেটুকু ছিল তাও গেল মামলা লড়তে। সর্বস্বান্ত হয়ে লালমোহন ফিরে এল, এসে আর গুনাইগাছিতে পা দেয়নি। আশ্রয় নিল নয়নপুরের বাজারে।

আখড়ায় কে আগুন দিল এ প্রশ্ন অনেকের মনেই অমীমাংসিত ছিল কিন্তু লালমোহন অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিল তার সাধের বাগানে আগুন দিয়েছিল অমৃত শাঁখারী এবং অমৃত স্মৃতীশের বিশ্বস্ত অনুচর। যেদিন লালমোহনের বিশ্বাস জন্মাল স্মৃতীশের দল তাকে পথে বসিয়েছে, সেদিন তার সামর্থ্য আর ছিল না। বিশেষ করে স্মৃতীশও তার অনুচরদের সুপুষ্ট পেশীর আস্ফালন দেখে তার ভবিষ্যত সম্বন্ধেও বিশেষ শঙ্কিত হতে হল।

লালমোহন স্মৃতীশকে ভয় করে স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু স্মৃতীশ তাকে অনুকম্পার চোখে দেখে। রাস্তায় দেখা হলেই, কেমন আছ লালুদা? না জিজ্ঞাসা করে পথ ছাড়তে চায় না।

লালমোহনের সাথে পরিচিতির এই পশ্চাদ্‌ভূমি স্মৃতীশ আর মনে রাখতে চায় না। বিগত দু বছরে স্মৃতীশের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় এবং অকল্পনীয় ভাবে সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত না করে পারেনি। স্মৃতীশও বুঝেছে,

লালমোহনের পরিবর্তনকে কাজে লাগাতে পারলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা মোটেই।

নীতিশের সাথে অনেক যুক্তি পরামর্শের পর স্থির হল, গ্রামে মেয়েদের ইস্কুল বসাতে হবে। নিজেদের আটচালায় বর্তমানে ইস্কুল বসবে। ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারলে ব্যবস্থা হবে অন্য ঘরের। নীতিশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ইস্কুল চালু করে দিতে পারলে তাকে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব নীতিশের।

স্বতীশ সদলে গ্রামের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগল। কন্যামন্দিরের কন্যা পাঠার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলনা তাদের মেয়েদের নিয়ে। পুরুষ অভিভাবকরা সম্মতি দিলেও গৃহিনীরা মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাবার ঘোরতর বিরোধী। স্বতীশ বুঝতে পারল নীতিশ কেন তাকে ইস্কুল চালু করবার দায়িত্ব দিয়েছে। গ্রাম্যজীবনের সাথে নীতিশের যত বেশি পরিচয় স্বতীশের সে অনুপাতে পরিচয় কম। তা বলে স্বতীশও হার মানতে রাজি নয়। রায়গোষ্ঠী থেকেই এগারটি কচিকাচা মেয়ে সংগ্রহ করে পাঠশালার উদ্বোধন করল। উদ্বোধনে নিমন্ত্রিত দশ পনেরজন গ্রামবাসীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে স্বতীশ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে এল।

নীতিশ পড়ল ফাঁপরে। ইস্কুল চালিয়ে নেবার দায়িত্ব তার। অথচ সামনে তার মোক্তারি পরীক্ষা। এতদিন বয়সের স্বল্পতা হেতু পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবারই তার প্রথম সুযোগ। সেই কারণেই স্বতীশকেই স্কুলে পড়াবার দায়িত্ব দিয়ে নীতিশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইল।

সকাল সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি টহল দেওয়া একটা নতুন কাজ। যেমন করেই হোক ছাত্রী সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু এগারোর সংখ্যা আর বারোতে উঠল না। অটুট আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বতীশ তবুও এগোতে থাকে।

আজ রবিবার। স্কুল বন্ধ। আজ সকাল থেকেই স্বতীশ ছাত্রী সংগ্রহের প্রোগ্রাম করে নিকটবর্তী গ্রামে যাচ্ছিল। রাস্তায় লালমোহনের সাথে দেখা। লালমোহন ধামা বোঝাই আনাজ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিল। পথে স্বতীশের গলার শব্দ শুনে এগিয়ে এল।

বাজারে যাচ্ছ বুঝি ?

হাঁ খোকাবাবু। আপনি ইদিকে কোথায় ?

তুমি বুঝি শোননি। আমরা মেয়েদের ইস্কুল করেছি। করলেই তো হয় না বাপু। মেয়েরা পড়তেই আসে না। তাই যাচ্ছি পাশের গাঁ-গুলোতে যদি দু চারজন ছাত্রী আনা যায়।

লালমোহন মাথা নেড়ে পণ্ডিতের মত বলল, মুর্খ্যু আর বদমাশরা নিজের ভাল দেখতে পায় না। তারা ঠকলে শেখে। এই যেমন আমি।

স্মতীশ বাধা দিয়ে বলল, ওসব কথা ছাড়, তোমার গ্রাম থেকে মেয়ে আনতে পারবে ? পড়ুয়া ছোট ছোট মেয়ে।

লালমোহন চলতে চলতে বলল, পারব কিনা জানিনা। তবে গুরুর ইচ্ছায় চেষ্টা করব।

চেষ্টা লালমোহন করেছিল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে দুইটি বালিকা সহ অবিভাবকদের টানতে টানতে ইস্কুলে হাজির করল।

পাঠার্থী দুজনের পাঠগ্রহণের ইচ্ছা কতটা প্রবল তা বুঝতে বিলম্ব হল না। একটির পিতা নলতে মুচি। অপরটির পিতা নবীন বেহারা। উভয়েই ক্ষেত মজুর। লালমোহন তাদের আশা দিয়েছে ইস্কুলে পড়তে গেলে কিছু না হোক দুইটি পরিধেয় লাভ হবে। লাভের আশায় তারা উপস্থিত হয়েছে।

নলতে মুচির মেয়েকে ডেকে স্মতীশ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ?

ছয় হাত কাপড়ের অতি ময়লা একটি টুকরো তার পরণে, গায়ের রঙ্ আর মাটির রঙ্-এ কোন তফাত নেই, মাথায় এক বোঝা জট। ঘুম থেকে উঠে মুখ পর্যন্ত ধুয়ে আসেনি। স্মতীশ এইগুলোই ভাল করে দেখছিল। বালিকা এই অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলল। নাম বলা তার হল না।

লালমোহন ধমকে উঠল, কাঁদিস কেন, নাম বল।

স্মতীশ ধীর কণ্ঠে বলল, রাগছ' কেন লালু দা ? ওরাতো এসব দেখেনি, শোনেনি। ওরা ঘাবড়ে যাবেই তো। প্রথমদিন কলেজে গিয়ে আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সবাই ওরকম হয়। আস্তে আস্তে ওরা পোষ মানে।

কথা শেষ হতে না হতেই স্মতীশ দেখতে পেল উঠোনে লাল শালুর পাগড়ি মাথায় বেঁধে নয়নপুরের পেয়াদা কাকে যেন খুঁজছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চায়।

পেয়াদা সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে চিঠি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, নীতীশ বাবুর চিঠি।

স্মতীশ চিঠি খুলে দেখল, খোদ মহারাজা চিঠি দিয়েছে। সাতদিনের স্থলে চোদ্দ দিন পেরিয়ে গেছে। মহারাণীর তীর্থ ভ্রমন তার জন্য আটকে আছে, পত্রপাঠ সে যেন চলে আসে।

চিঠি হাতে নিয়ে স্মতীশ সুখদার কাছে গেল। নীতিশ আন্দুরায়ের জমিতে নিড়ান দিতে যাচ্ছিল। চিঠির কথা শুনে সেও ফিরে এল।

সারাদিন ধরে অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হল স্মতীশের কলিকাতা যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তীর্থ ভ্রমন শেষ করে সে যেন শান্তির সাথে দেখা করে আসে এ নির্দেশও তারা দিল।

কলিকাতায় নেমেই সোজা এসে শ্যামের বাড়ির সেরেস্তায় বসল। নায়েব প্যারীমোহন স্মতীশকে দেখে আনন্দিত হলেও এ আনন্দ ক্ষণিকের। স্মতীশ যখন জানাল মহারাজার পত্র পেয়ে সে কলিকাতায় এসেছে, তখন নায়েব মশায়ের মনে পড়ল তীর্থ ভ্রমনের প্রোগ্রাম। অল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ যুবককে যে দায়িত্ব দিয়ে মহারাজা পাঠাচ্ছেন, সে দায়িত্ব পালন কতটা সম্ভব হবে তা প্যারীমোহন বুঝতে পারল না।

মহারাজার সাথে দেখা করেই স্মতীশ ছুটল প্রবীরের খোঁজে। গিয়ে দেখল বাড়ি খালি। বুলু আর তার মা রয়েছে। ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে প্রবীর লালবাগে গিয়েছে। পরীক্ষার ফল বের হলে তবেই তারা ফিরবে।

বুলু জিজ্ঞাসা করল, কবে এলে ?

আজই এসেছি।

বাড়ির সবাই ভাল আছে তো।

সবাই ভাল আছে। মনে হচ্ছে আমি একাই ভাল থাকতে পারছি না।

উৎকণ্ঠার সাথে বুলু জিজ্ঞাসা করল, তোমার কোন অসুখ বিসুখ ?

আমার অ-সুখ সব সময়। সেবার বলে গেলাম, মহারাণীর তীর্থ ভ্রমনের বাজার সরকারি করতে হবে। তাই করতে এসেছি। ভাবছি এই মহান কর্ম সহ্য হবে কি না ?

সহাস্যে বুলু বলল, তাও ভাল। তোমার কথা শুনে তো ভয়েই মরি।

একে পণ্ডিত মানুষ, তার ওপর ইঙ্গিতে কথা বলা তোমার অভ্যাস। তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, টিকা যুক্ত করতে ঘেমে মরতে হয়। তা হলে কাল যাচ্ছ ?

হাঁ। কাল রাতে রওনা হতে হবে। রিজার্ভ গাড়িতে বিংশ শতাব্দীর রাজ্যহীন রাজার মহারাণী যাবেন, সঙ্গে যাবে ঝি-চাকর-বামুন-দারোয়ান এবং তস্য ইনচার্জ স্মৃতীশ রায় এবং তস্য মস্তকোপরি রইবেন স্বয়ং নয়নপুরের মহারাণী শ্রী-পঞ্চশ্রী অবন্তী দেবী।

ঠাট্টা রাখ। আসল কথা বল দেখি।

বড়লোকের কত সখ রয়েছে জান। বাঁদর পোষারও সখ রয়েছে, আবার বাঁদর মনে করে তারা মানুষও পোষে। আমি হলাম পোষা মানুষ, ধীরে ধীরে বাঁদরে পরিণত হব, বুঝলে। হয়ত যেতাম না, কিন্তু মায়ের আদেশ, দাদার উপদেশ এবং ভবিষ্যতের আশা। এই তিনটি মিলে অমৃতময় স্টু তৈরী হয়েছে মনের কোনায়, তারই ফল প্রাপ্তি ঘটবে। আচ্ছা চলি। প্রবীরকে চিঠি দিলে আমার কথা লিখ।

ফিরে এসে পুরাতন বাসস্থানের চাবি সংগ্রহ করে স্মৃতীশ মেঝের উপর গামছা বিছিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। ছুটির তিনমাস যে পরিবেশে দিন কাটাবে মনে করেছিল সে পরিবেশ তাকে হারাতে হয়েছে। তবুও ভ্রমনের আনন্দ দিয়ে পরিবেশের আনন্দকে ঢেকে দিতে পারবে, এই হল সান্ত্বনা।

মহারাণীর খাস দাসী মোক্ষদা এসে জানিয়ে গেল, মহারাণীর সাথে যেন সে অবিলম্বে দেখা করে। যাবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও কেমন যেন লজ্জায় সে যেতে পারছিল না। তার দেরী দেখে মোক্ষদা আবার আসতে বাধ্য হয়েছে। এবার সাথে করে নিয়ে যাবার আদেশ পেয়েছে। বাধ্য হয়েই স্মৃতীশ মোক্ষদার পেছন পেছন হাজির হল অন্দর মহলে।

ঘরের পর ঘরের সারি। মাঝ খানটায় টানা বারান্দা। বারান্দার শেষ কোনায় শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে হাজির হল মহারাণীর খাস কামরায়।

মহারাণী !

মুখ তুলে একবার দেখেই নমস্কার করল।

মহারাজকুমারের মা। হিসাব করে দেখল, মহারাণীর বয়স চল্লিশ পার হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বয়স কমিয়ে দিয়েছে অন্তত পনর বছর।

হতভম্বের মত স্মৃতীশ দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি খাবে আমার সাথে?

আজ্ঞে হাঁ।

মোক্ষদা খাবার নিয়ে আয়, আমার সরবত।

ছোট টিপয় সোফার সামনে টেনে দিয়ে মোক্ষদা বেরিয়ে গেল।

মহারাজা তোমাকে বড্ড ভালবাসেন।

মাথা নীচু করে স্মৃতীশ মৃদু স্বরে বলল, সেটা তাঁর মহানুভবতা।

মহানুভবতা। তা বটে।

বড়ই বেসুরা মনে হল মহারাণীর কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে মহারাণী আবার বলল, তোমার মা তোমাকে খুব ভালবাসেন?

মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে স্মৃতীশ বলল, সব মা-ই তো ভালবাসেন।

মহারাণী চমকে উঠল।

বললেন, ভালাবাসা উচিত। কিন্তু কৃতি সন্তানের প্রতি মায়ের একটু বেশি টান থাকে, নয় কি।

স্মৃতীশ প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল।

মোক্ষদা খাবার দিয়ে গেল।

স্মৃতীশকে পাশে বসিয়ে খেতে দিয়ে মহারাণী বললেন, আমার সাথে তোমাকে মাসাধিক কাল থাকতে হবে। পরিচয়টা তাই ঘনিষ্ঠ করে নিলাম।

স্মৃতীশ কোন রকমে ভোজ্য বস্তু গলাধকরণ করতে করতে বলল, তা বটে।

রাজা-রাণী নিয়ে চলা বড় কঠিন কাজ। বয়স তোমার কম, সামলে চলতে পারবে তো।

আশা করছি।

মহারাণী হাসল। সরবতের গেলাস তুলে কয়েক চুমুক খেয়ে রেখে দিল। অনেক দিনই তো রাজবাড়িতে রয়েছে, রাজার বাড়িতে থাকাতো কখনও

হয়নি। আজ তুমি অতিথি, রাজার বাড়িতে আজ থেকে যাও। মোক্ষদা। স্বতীশকে নাচ ঘরের পাশের কামরায় শোবার জায়গা করে দে।

স্বতীশ মিনতি সহকারে বলল, আমার থাকবার জায়গা তো রয়েছে, সেখানেই থাকব। এখানে,—

ঘুম হবে না? —ঘুম না হলে নাচ দেখ। অনেক রাত অবধি নাচ হবে।

আমায় মাপ করুন।

কঠিন কণ্ঠে মহারাণী বলল, চল।

স্বতীশ কিছুই বুঝতে পারলনা। স্থির কথোপকথনের মাঝে এমন রুঢ় এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠের আদেশ সে প্রত্যাশা করে নি। নিরুপায়ের মত মহারাণীর পেছন পেছন নির্দ্দিষ্ট কামরায় এসে বসল।

যদি ঘুম না হয়, এই পর্দা তুলে নাচ দেখ। বুঝলে! বলেই মহারাণী বেরিয়ে গেলেন। মোক্ষদা টিপয়ে এক গ্লাস জল রেখে দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে গেল।

পাশের হল ঘরে তখন নাচের মজুরা চলেছে। ভেসে আসছে বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর শব্দ, ঘুঙুরের আওয়াজ। স্বতীশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, রাজবাড়ির এই জীবনের সাথে তার কোথাও মিল নেই, অথচ ভাগ্যগুণে তাকেই আসতে হয়েছে এই আবেষ্টনীতে। ঠিক সে বুঝে উঠতে পারেনি এখানকার বাসিন্দাদের। মহারাজা এবং মহারাণী দুজনকেই হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। অতি অস্পষ্ট, কোথায় যেন ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছে। নাচ ও সঙ্গীত দিয়ে এই আর্ত্তনাদ ঢাকা দিতে চায় এরা।

রাত বাড়ছে। সঙ্গীতে শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। স্বতীশ পাশ ফিরে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। ঘুম আর আসে না।

রাতের গভীরতা বৃদ্ধি পেল। সঙ্গীত থেমে গেল। নাচের পর্ব বোধহয় শেষ।

বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে পর্দার পাশ দিয়ে উঁকি দিল।

সারেঙ্গীর সারেঙ্গ মেঝেয় লুটাচ্ছে, পাশে লুটাচ্ছে সারেঙ্গী। নর্তকীর পদচারণা থেমে গেছে। অর্দ্ধনগ্ন নর্তকী মহারাজার পাশে এলিয়ে পড়েছে সবচেয়ে বড় সোফাটায়। মহারাজাও বোধহয় ঘুমন্ত। বাতাসে ভেসে আসছে উগ্র গন্ধ। তবলচি তবলার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। প্লেটের

আহার্য্য ছড়িয়ে রয়েছে গালিচায়। মনে হল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেখানে যেন মল্লযুদ্ধ হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পরদা নামিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। দেউঁড়ীর ঘড়িতে দুটো বাজল। তন্দ্রার ঘোর নেমে এসেছে চোখে।

কে যেন চুপি চুপি এসে আলো জ্বেলে দিল।

চোখ বুঁজেই জিজ্ঞাসা করল, কে ?

ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমি মোক্ষদা।

এত রাতে তুমি কেন মোক্ষদা ? স্মৃতীশ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

মোক্ষদা কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, খোকাবাবু, আপনি এখান থেকে পালিয়ে যান। আপনার থাকবার মত জায়গা এটা নয়।

কেন ?

নাইবা শুনলেন। আমরা দাসী বাঁদী, শতেক খোয়ার সহ্য করে এখানে থাকি, আশ্রয় কোথাও নেই। আপনার জীবন পড়ে রয়েছে। পালিয়ে যান।

মোক্ষদা ধীরে ধীরে পেছন ফিরে চলতে লাগল।

আবার অন্ধকার। আলো নিভে গেছে। নুপুরের আওয়াজ আর নেই।

স্মৃতীশ চিন্তার অতল গহ্বরে হাবুডুবু খেতে থাকে।

সকাল হবার প্রত্যাশায় সে বসে রইল।

সারা রাতের ক্লান্তি নিয়ে ভোরবেলায় সোজা এল শ্যামের মন্দিরে। প্যারীমোহন তখনও সেরেস্তায় আসেনি। তারই প্রতীক্ষায় বসে বসে দেওয়াল ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

প্যারীমোহন সকালে এসে স্মৃতীশকে বসে বসে ঘুমতে দেখে ডেকে তুলল।

এত সকালে কোথা থেকে এলে খোকা ? আর বসে বসে ঘুমোচ্ছ কেন ?

স্মৃতীশ কেঁদে ফেলল। কোন কথা বলতে পারল না।

কাঁদছ কেন ?

সবিস্তারে সব ঘটনা বলে অভিভূতের মত হয়ে রইল স্মৃতীশ।

পারীমোহন বলল, মোক্ষদা ঠিকই বলেছে। পালিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। বোধহয় পালান ভিন্ন পথও নেই। যেখানে আসল মানুষ নেই, সেখানে অক্ষম মানুষের বসবাস প্রীতির নয়। সেও অমানুষে পরিণত হয়।

অনেকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করে প্যারীমোহন ডাকল, খোকা।

বলুন।

ওদের আদর যেমন সর্বনাশা অনাদর তেমনি ভয়ঙ্কর। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যদি চলতে পার তাহলে তুমি যেতে পার। কিন্তু হুঁশিয়ার। বাঁচা অথবা বাঁচতে চাওয়া যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সমস্যা শুধু পথের। পথ ভুল হলেই জীবনের অসম্পূর্ণতা দেখা দেবে, বুঝলে। তাই পালাতে চাইলেও, এখন পালিও না।

স্মৃতীশ কোন সান্ত্বনা খুঁজে পেল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়ে নিল।

সন্ধ্যাবেলায় হাওড়া ষ্টেশনে সবাইকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে স্মৃতীশ বাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। পাশের কামরায় রইল তিনজন দাসী সহ মহারাণী। স্মৃতীশের কামরায় রইল তিনজন দারোয়ান, দুজন ভৃত্য আর একজন পাচক। সঙ্গে রইল একশত মন লটবহর।

গাড়ি এগিয়ে চলল তীর্থের পথে।

প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরতে ঘুরতে একমাস কেটে গেল। মহারাণী মথুরা এসে হুকুম দিল, স্ট্রাইক দি টেণ্ট ফর ডেহলি।

দিল্লিতে এসেই স্মৃতীশ বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিল, এবার ফেরবার হুকুম দিন।

মহারাণী হাসলেন।

এ হাসি স্মৃতীশ চিনতে শিখেছে। অনুকম্পার হাসি। অসম্মতির হাসি। চুপ করে রইল।

মহারাণী বলল, এতদিন তীর্থ-ধর্ম হল, এবার দেশভ্রমণ আরম্ভ হবে। প্রোগ্রামটা শুনে নাও। সিমলা, লাহোর, পেশোয়ার, করাচি, বোম্বাই, পুণা, বাঙ্গালোর, তারপর, তারপর।

অনেকদিন প্রয়োজন।

দিনের প্রয়োজন বলেইতো বলছি। নাউ স্ট্রাইক দি টেণ্ট ফর সিমলা। দিল্লি বড্ড গরম। সিমলা গিয়ে কিছুকাল বাস করব।

আবার চলতে হল।

আম্বালা, কালকা, সিমলা। গাড়ি থামল।

সবাই হোটেলে জায়গা করে নিল।

এখানে পনর দিন, বুঝলে ? মহারাণীর অনুজ্ঞা জারি হল।

স্বতীশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে বসল। অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি। কাগজ কলম নিয়ে বসল।

দাসী এসে জানাল মহারাণী দেখা করতে বলেছেন।

স্বতীশ যেন প্রতিজ্ঞা করে বসেছে চিঠি না লিখে উঠবেনা। যাবার তাগাদা থাকলেও সে উঠল না।

মহারাণী যে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে তা সে জানতেও পারেনি। হঠাৎ কানের কাছে শব্দ হল, বুলু কে ?

বুলু, থতমত খেয়ে স্বতীশ বলল, আমাদের পরিচিত একটা মেয়ে।

তোমার বান্ধবী ?

মহারাণীর মন্তব্য ও কণ্ঠস্বর অকল্পনীয়। স্বতীশ স্থির হয়ে বসে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বলল, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মহারাণীর মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে বলল, ওটা আমার কথার জবাব নয়।

জবাব পাবার প্রত্যাশায় আপনি জিজ্ঞেস করেছেন কি ?

ক্ষিপ্তের মত মহারাণী চিৎকার করে উঠল, বলল, কথা বলবার সময় তোমার মাত্রাজ্ঞান থাকেনা দেখছি।

স্বতীশ আচমকা আঘাতে সম্বিত ফিরে পেল, বলল, মাপ করবেন, আপনি স্মরণ করিয়ে না দিলেও আমি আমাকে কখনও ভুলি না। আপনিই ভুলে গেছেন অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাজরাণীর স্থান সঙ্কুলান সর্বত্র সম্ভব হয় না। স্বয়ং ভগবানেরও এ বিষয়ে কোন এক্তিয়ার নেই।

নেই ?

না, নেই। আমি এসেছি মহারাজার অনুরোধে, বেতনভোগী ভৃত্য আমি নই, শুধু শালীনতার দাস। আপনি আপনার গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক বেশি এগিয়ে এসেছেন।

বসন্তপুরের রাজকন্যা, নয়নপুরের মহারাণী অবন্তী দেবী, তাকে এমন কথা কেউ বলতে পারে এ স্বপ্ন উন্মাদেও কখনও দেখেনি। অচিন্তনীয় এই উক্তির আঘাতে মহারাণীর কণ্ঠস্বর ক্রোধের প্রাবল্যে বন্ধ হয়ে গেল। রক্তিম মুখমণ্ডলে

কে যেন অলক্ষ্যে একপোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গেল। চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহারাণী বেরিয়ে গেলে স্মৃতীশের মন হয়ে উঠল বেদনায় আচ্ছন্ন। এমন রূঢ় আঘাত অপরকে দেওয়া উচিত হয়েছে কি না ভেবে পেল না। তবে বুঝল, মহারাণীর সাথে আর একদিনও বাস করা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা এল ডাকঘরে। লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাল মহারাজার নামে।

ফিরে এসে কামরা বন্ধ করে শুয়ে রইল। খেতেও গেল না।

সন্ধ্যার সময় টেলিগ্রামের জবাব এল, তোমরা সবাই ফিরে এস।

সামনেই মোক্ষদা দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতে কাগজখানা দিয়ে বলল, মহারাণীকে দাও।

স্মৃতীশ এসে বসল নিজের কামরায়। অস্থির চিত্তবৃত্তিতে ঘেমে উঠল।

দরজা ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়াল মহারাণী।

স্থির দৃষ্টিতে স্মৃতীশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বসল, তুমি বলতে চাও আমাকে ফিরতে হবে।

আমার কথা নয়। যিনি বলবার কর্তা তিনিই বলেছেন। ফেরা না ফেরা আপনার অভিরুচি।

অভিরুচি। বেশ। এ তারের জবাব আমি দেব। তুমি ফিরে যেতে পার।

সারারাত স্মৃতীশ বসে বসে ভেবেছে। কোন কুল কিনারা না পেয়ে বুলুকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা নিয়ে বসল। লিখল :

আজকের ঘটনা আমার জীবনে নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথ খুলে দিয়েছে। মহারাণী আদর করে রাজবাড়ির একরাতের জীবনের সাথে পরিচিত করে দিয়েছিলেন, আবার তিনিই তোমাকে চিঠি লিখতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন আজ সকালে। কেন যে এমন করলেন তা মোটেই বুঝতে পারলাম না। কেমন যেন ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। চোখ খুলে তাকাতে পারছি না। হয়ত এই চিঠি পৌঁছাবার আগেই তোমাদের সাথে দেখা হবে, কেননা বিদায় দেওয়া নেওয়া শেষ হয়েছে।

আরেকখানা চিঠি লিখল প্রবীরকে। লিখল :

কালকে দিল্লিতে ছিলাম। আজ এসেছি সিমলায়। ঠাণ্ডা গরমের সংমিশ্রনে এমন এক রাসায়নিক দুর্যোগ আজ ঘটেছে যার তুলনা পাওয়া দুঃসাধ্য।

দিল্লি পর্যন্ত ছিলাম মহারাণীর পার্শ্বচর। সিমলায় এসে পার্শ্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। একদিনের ব্যবধানে কত বড় পরিবর্তন ঘটল তা ভাবতেও পারবে না।

অর্থের জৌলুস দেখে মনে হয় এরা কত সুখী, কিন্তু হৃদয়দেশে প্রবেশ করতে পারলে বুঝতে পারবে এরা কত দরিদ্র এবং অসুখী। যাত্রার দলের রাজারাও নিজের ব্যক্তি ধর্মে ফিরে আসে, নিজেদের সম্বন্ধে সজাগ থাকে, কিন্তু তাসের ঘরের রাজারা তাও পারে না। বলতে গেলে এদের মত দুর্ভাগা আর নেই।

দিল্লিতে মহারাণী সেজেগুজে বের হতেন। তাঁর বেশভূষায় মনেই হত না আমার সমবয়সী তাঁর ছেলে। একদিন তাঁকে বললাম, সবাই দিল্লি দেখতে আসে, আপনি যেন দিল্লিকে দেখাতে এসেছেন।

নফরের মুখে এত বড় কথা। মহারাণী হজম করলেন, হাসলেন। এদের হাসির অর্থ আগে বুঝতাম না। এখন বুঝি। হাসি এদের আভরণ, মনের ছবি নয়।

মহারাণী প্রসাধন সেরে এসে বললেন, চল। বাদশাহী গৌরবকে লজ্জা দেবার মত সম্পদ যদি থাকত তা হলে মমতাজমহলকেও মুখ উঁচু করবার সুবিধা দিতাম না।

এলাম ইন্দ্রপ্রস্থে।

যমুনার কিনারায় ভাঙ্গা কেল্লার সিঁড়িতে বসলেন। দূরত্ব রক্ষা করে আমিও বসলাম। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রইল বন্দুকধারী শান্ত্রী।

বললেন, শুনতে পাচ্ছ ?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ?

মহারাণী হাসলেন, বললেন, কান নেই শুনবে কি করে। পাথরের টুকরোয় যমুনা আছড়ে পড়েছে। পাথর কাঁদছে। সমাজ পুরুষকে মালিকানার সত্ব দিয়েছে বলেই নারীর ক্রন্দন পাথরের বুকেও শোনা যায়।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মহারাণী কবি, মহারাণী ভাবুক, আরও কত কি,

কিন্তু শ্রোতা তাঁর এ কাহিনী শুনবার যোগ্য নয় একথা তাঁর খেয়াল নেই।
মহারাণী কান পেতে শুনছেন। বললাম, চলুন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।
হাঁ চল। সে যুগেও হারেমের বেগমরা কেঁদেছে, এযুগেও হারেমে বসে রাণীরা কাঁদছে। এক, সবই এক। শুধু তফাৎ যুগধর্মের।
উঠে এসে আমার হাত ধরে বললেন, বেগমরা বাঁচত কেন, জান?
কথা না বলে তার হাত ছাড়াবার ধীর অথচ সংযত চেষ্টা করতে থাকি। নিস্ফল হলাম।
চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্ণিমার কত দেরী?
বললাম, জানিনা।
জানা উচিত। বলে মহারাণী হো-হো করে হেসে উঠলেন।
বন্দুকধারী শান্ত্রী চমকে উঠল।
এবার কোথায় যাবেন?
যেখানে যাওয়া সহজ, জাহান্নামে।
বলতে চাইলাম সে রাস্তাও সুগম নয়। বলতে পারলাম না।
হোটেলে ফিরে এসে রোজকার মত আমাকে খেতে দিলেন, হাত মুছবার তোয়ালেটাও হাতে তুলে দিলেন।
সেই মহারাণী আজ বিদায় অভিশাপ জানিয়েছেন, অভিনন্দন নয়।
হেঁয়ালির মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি। তুমি কি এর জবাব দিতে পার?

লেখা শেষ করে স্মৃতীশ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বিগত এক মাসের খুঁটিনাটি ঘটনা।

দরজা ঠেলে মোক্ষদা ঢুকে বলল, মহারাণী চা নিয়ে বসে আছেন।

স্বয়ং ভগবান সামনে এসে দাঁড়ালে স্মৃতীশ অত আশ্চর্য হত না, যতটা আশ্চর্য হল মোক্ষদার কথা শুনে। তার মনে হল, অন্যের অহমিকার দুয়ারে নিজের ব্যক্তিত্বকে যারা লাঞ্ছিত হতে দিতে চায় না, তারা অপরের আদর-অনাদর, অনুগ্রহ-নিগ্রহ কোনটাকেই সহজে গ্রহণ করতে পারে না। অনভিজ্ঞ স্মৃতীশও বুঝতে পারল এই অস্থির চিত্তের পশ্চাতে কি জাতিয় মনোধর্ম সক্রিয় রয়েছে।

উঠে বসল, বলল, মহারাণীকে বল, আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।

মঞ্চের নিপুণ অভিনেতার সৌকর্য্য নিয়ে হাজির হল স্বয়ং মহারাণী। বলল, কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না।

আপনার অনুগ্রহ।

মোক্ষদা পাশ কাটিয়ে ফিরে গেল।

বেদনাহত কণ্ঠে মহারাণী বলল, আমারও একটা ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে। সেখানে গেরস্ত বধুর মত আপন সংসারের সাম্রাজ্ঞী হবার সাধ রয়েছে, সে সাধ পূর্ণ হয়নি। পেয়েছি বিলাস, বিলাস আমার মত রাণীদের আবরণ। অশান্তিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার অস্ত্র। এ অস্ত্র যদি না থাকত তা হলে মহারাণী হবার সৌভাগ্য যারা কামনা করে তারা আতঙ্কে মূর্চ্ছা যেত।

স্বতীশ অবাক হয়ে মহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মহারাণীর বেদনার্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হল নারীত্ব ও মাতৃত্বের নিরাশাপূর্ণ বুভুক্ষা। স্বতীশ ভেবেও পেল না, এত বড় দম্ভের যে প্রতিমূর্তি, তার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে কি করে এত বেশি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকতে পারে।

মহারাণী কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। অসারে তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসতেই দুর্বলতাকে গোপন করবার ব্যর্থ প্রয়াসে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

স্বতীশ মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, এ প্রসঙ্গ বাদ দিন।

প্রসঙ্গ বাদ দেব? দেওয়া উচিত। কিন্তু শূণ্যতাকে পরিমাপ করে নিও। যারা পাওয়ার অভিনয় করে তারা পায় না, যারা না পাওয়ার গৌরবে আত্মবিস্মৃত হয় না, তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কে শুনবে আমার কথা। এমন একজন লোক খুঁজে এসেছি আজীবন, যে শুনবে, আহা বলবে, জানবে, কিন্তু তাকে পাইনি। তাই দম বন্ধ হয়ে আসছে। তোমারও মনের কথা বলবার লোক রয়েছে, আমার তাও নেই।

মহারাণী ফুঁপিয়ে উঠল।

স্বতীশ বলল, এই তো শেষ নয়।

নয়?—এ জীবনের পরিসীমা টেনে আনলেও, আরও জীবন পেছনে পড়ে রয়েছে। তারা আসবে, অনন্তকাল অবধি আসবে। সেদিন আমার মতো মহারাণীদের পরিত্যক্ত অভিজ্ঞতা হবে তাদের পাথেয়।

চোখ মুছতে মুছতে মহারাণী নিজের কামরায় চলে গেল।

স্মৃতীশ প্রবীরকে লেখা চিঠিখানা খুলে পুনশ্চ দিয়ে লিখল :

যা মনে করেছিলাম তা নয়। মাকাল ফলের তিক্ততা ফলের বুকে কালো ছাপ রাখে, নইলে বাহিরটা তার রাঙা হত না। যারা ভেতরটা দেখতে পায় তারাই ভাগ্যবান। সেই ভাগ্যকে মাথায় পেতে নিয়েছি। মহারাণী আর দুলে পাড়ার কুসমি, এদের পার্থক্য কোথাও নেই, নেই বলেই মহারাণীও কেঁদেছে। হৃদয় ধর্মে সে যে কত দরিদ্র তা কল্পনা করা যায় না। শাক-পাতা খেয়ে কুসমি হেসে বেড়ায়, পোলাও কালিয়া মুখে দিয়েও মহারাণী কাঁদে।

চিঠি ভাঁজ করে স্মৃতীশ শুয়ে পড়ল।

মোক্ষদা এসে ডাকল, খোকাবাবু।

কেন মোক্ষদা ?

তুমি তা হলে যাবে না ?

যাওয়া আর হচ্ছে কোথায়।

গেলেই ভাল হত।

অনেক কিছুই তো ভাল হয় কিন্তু সব কিছু কি করা যায়।

তা বটে। মোক্ষদা ফিরে গেল।

এই মোক্ষদা প্রয়াগে স্নান করে এসে স্মৃতীশের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন থাকে।

কেন এই আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন তা স্মৃতীশ বুঝতে পারেনি। আগের দিন যখন মোক্ষদা তার আত্মকথা বলতে বলতে নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত করেছিল রাজ-বাড়ির নোংরা জীবন তখন স্মৃতীশ ক্ষিপ্তের মত তার হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন ভাবে বলেছিল, তোমার লজ্জা করল না। বাবা এবং ছেলের একই ভাবে মনোতুষ্টি করবার আগে গলায় দড়ি কেন দিলে না! কেন মরলে না ?

অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় মোক্ষদার চোখ জল্ জল্ করে উঠল। গুরু গম্ভীর স্বরে যা বলেছিল তার অর্থ, মানুষ মরতে চায় না খোকাবাবু। মানুষ বাঁচতে

চায়। আশা আকাঙ্খা হারিয়ে লাঞ্ছনাকে মাথায় পেতে নিয়েও মানুষ বাঁচে। কেন বাঁচে সে কথা সে বলেনি।

চোখে আঁচল তুলে দিয়ে মোক্ষদা পালিয়ে বেঁচেছিল।

সেই মোক্ষদাই পরের দিনই আশীর্বাদ কামনা করেছে। অদ্ভুত নারী। দারিদ্র্য অক্ষমকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে ভেবে পেল না। আজকেও যখন আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিল পালাবার পথ খুঁজতে, তখন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ভেবে ঠিক করতে পারল না, মোক্ষদার বক্তব্য কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি।

লুঞ্চ থেকে খেয়ে এসে বসতে না বসতেই মহারাণী এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর কি ভাল নয়?

স্মৃতীশ হাসল। কয়েক ঘণ্টা পূর্বের ঘটনা মহারাণী যে বেমালুম ভুলে গেছেন এ কথা সে বিশ্বাস করে না। তবুও শালীনতার খাতিরে সে হাসল।

কথা বলছ না কেন?

শুনলে খুশী হবেন কি?

অখুশী হলেই বা কি, তুমিতো বেতনভোগী ভৃত্য নও।

খোঁচাটা মারাত্মক, তবুও স্মৃতীশ বলল, আপনাদের রাজকীয় জীবনকে ভালবাসতে পারিনি মহারাণী।

মহারাণী নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেন গভীর মনোযোগ সহকারে স্মৃতীশের মনকে পাঠ করছিল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠল, এত অল্পে ভালবাসা মন্দবাসা শেষ করতে নেই। পস্তাতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যারা এই জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছে তাদের কথা একবার ভাব দেখি।

ভাবিনি কখনও, দরকারও হয়নি। আর বয়সই বা আমার কত। বিশ বছর পুরো হয়নি এখনও। ছোট্ট এই মাথায় অত জানার স্থানও হয়ত নেই। তবে বুঝতে পেরেছি, বনের বাঘ হিংস্র কিন্তু কপট নয়। তার সম্বন্ধে মানুষ সতর্ক থাকবার অবসর পায়। কিন্তু সভ্য মানুষ যখন ভাল মানুষের নামাবলী গায়ে দিয়ে কপটতার মুখোস পরে বঞ্চনা করে তখন ভয় হয় বেশি। অসতর্ক মুহূর্তে কখন বা তারা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভয় থাকে বেশি।

আত্মহারার মত মহারাণী চিৎকার করে উঠল, এমন নিখুঁত ভাবে অধ্যয়ন শেষ করেছ, তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বলতে পার, কি করলে এই মানসিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারি! কি করলে অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল, অন্যায়কে অন্যায় দিয়েই প্রতিরোধ করতে হয়। মনে হয়েছিল, এই পথই প্রশস্ত পথ। এই পথে বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, আছে শুধু অতৃপ্তি আর অশান্তি। ওপথে যেতে পা উঠল না। আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি সেই একই কথা।

বড়ই কঠিন প্রশ্ন।

কঠিন প্রশ্নের সহজ সমাধান চিরকাল পাওয়া গেছে, ভেবে দেখ যদি কোন সমাধান তুমি খুঁজে পাও।

বিদ্যুতের মত প্রবীরের কথাগুলো তার মনে ভেসে উঠল। অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল, ভালবাসা।

মহারাণী চমকে উঠল। বলল, স্বামীকে ভালবেসেছি, সন্তানকে ভালবেসেছি, কৈ পরিতৃপ্তি আসেনি তো। অবিচার পেয়েছি, লাঞ্ছনা পেয়েছি, অশ্রদ্ধা পেয়েছি। ভালবাসা যে সমপর্য্যায়ের বিনিময়প্রার্থী।

স্মৃতীশ ক্ষণকালের জন্য মহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবল। মহারাণীর মুখে কেমন যেন ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। সেই কুঞ্চিত কপোলের দিকে নজর রেখে বলল, এ ভালবাসা হল মনুষ্যধর্মী। বুলুর দাদা প্রবীর আমার সহপাঠী। সে বলত, ভালবাসাকে বিরাটের মাঝে বিছিয়ে দিতে হয়। ভালবাসতে হবে মানুষকে, মানুষের গোষ্ঠীকে, মানুষের সুখ দুঃখকে।

স্মৃতীশের ধীর অথচ গুরুগম্ভীর বক্তব্য শুনে স্তম্ভিত ভাবে মহারাণী চেয়ে রইলেন। অপরিণত বয়স্ক একজন যুবকের কাছ থেকে এতবড় গুরুতর প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান লাভ ঘটবে তা স্বপ্নেও তিনি ভাবেন নি।

তাও কি সম্ভব। অসারে এই কয়টি শব্দ বেরিয়ে এল মহারাণীর মুখ থেকে।

আমিও ভেবেছি, তা সম্ভব নয়। সংঘর্ষ যেখানে অনিবার্য, সেই অনিবার্য সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলা কি সহজ। তবে মানুষইতো মহামানুষ হয়, আবার বনমানুষও হয়।

স্বতীশ ?

স্বতীশ চমকে উঠে বলল, বলুন।

এই কি তোমার অভিমত ?

আমার অভিমত আরও একটু বেশি। আমি মনে করি, মানুষ যেখানে আত্মকেন্দ্রিক সেখানে সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে গড়তে না পারলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব। শুধু ভালবাসাই সব নয়, সেই ভালবাসার রূপ পরিস্ফুট হতে পারে তখনই যখন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমষ্টির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে।

মহারাণী উঠে দাঁড়ালেন, কেমন যেন ক্লান্ত মনে হল তাঁকে। বলল, নাউ মাই বয়, ষ্ট্রাইক দি টেণ্ট। এবার ফিরে চল। যেতে যেতে ফিরে এসে আবার বলল, আমার ইচ্ছা নয় কোলকাতায় ফিরে যাই, তবুও সেখানেই চল।

মহারাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল।

স্বতীশ ভাববার অবসর পেয়ে অলস মনের সাথে যেন লড়াই করতে করতে হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না মহারাণীর মানসিক বিকলতার কারণ। অদ্ভুত এই নারীটি কেমন যেন ছাপ এঁকে দিল তার অনুসন্ধিৎসু মনে।

জুলাই পেরিয়ে গেছে। আগষ্টও যায় যায় অথচ স্মৃতীশের কোন সংবাদই নেই। মহারাণীকে পৌঁছে দিয়ে শান্তির সাথে দেখা করবার নাম করে চলে গেছে তার পর কোন সংবাদই রাজবাড়িতে পৌঁছায়নি। পরীক্ষার ফল বের হয়েছে অনেক দিন আগে, সৌজন্য পরবশ হয়েও তার খবর কেউ পাঠায় নি। মহারাণী মোক্ষদাকে দিয়ে সদর নায়েবকে ডেকে পাঠাল।

মহারাণা সরাসরি প্রশ্ন করল, রাজবাড়িতে স্মৃতীশ নামে একটা ছেলে থাকত। কলেজে পড়ত। তার কোন সংবাদ জানেন কি ?

সদর নায়েব চতুর ব্যক্তি। মহারাণীর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে, নইলে অনর্থ হওয়াও আশ্চর্য নয়। মাথা চুলকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আজ্ঞে রাজবাড়ির অতিথিশালায় কত লোক আসে যায়, তার কোন রেজিস্টার তো সদরে থাকে না।

সদর নায়েব বুদ্ধির পাশা ছেড়েছে বুঝতে পেরেও মহারাণী ক্ষুব্ধ হল না। বলল, এবার থেকে রেজিস্টার রাখবেন।

আজ্ঞে হাঁ।

কেউ যদি ছু বছর এ বাড়িতে বাস করে, বিশেষ করে সে যদি রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়, তার সম্বন্ধে কিছু জানবার প্রয়োজন আপনার নিশ্চয়ই ছিল, অন্তত থাকা উচিত।

আজ্ঞে ছিল। তবে মা, সুমার আর খতিয়ান এই তো আমার কাজ। তার বাইরে কিছু ভাববার সময় পাই না। এত বড় রাজত্বটা চালান তো সহজ নয়। এক দিকে দেওয়ান বাহাদুরের যা মেজাজ, অন্য দিকে নজর দেবার উপায় আছে! বরং প্যারীবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব। সে অনেক খবর রাখে।

বেশ। প্যারীবাবুর কাছ থেকে তার বিবরণ জেনে নিয়ে যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে, বুঝলেন।

আজ্ঞে হাঁ, বলে সদর নায়েব পালিয়ে বাঁচল।

সোজা এল শ্যামের মন্দিরে। প্যারীমোহনকে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম স্মৃতীশ নামে একটা ছোকরা এখানে থাকত, তার খবর কিছু জানেন?

প্যারীমোহন হিসাবের খাতা থেকে না মুখ তুলেই বলল, ঠিক ছোকরা নয়, মহারাজা বাহাদুরের আপন জ্ঞাতি ভ্রাতা।

সদর নায়েব অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করল, তাই নাকি?

আজ্ঞে হাঁ।

অথচ আমাকে এ সংবাদ কেউ দেয়নি। রাজার চৌদ্দ পুরুষের ঠিকুজি আমার কাছে, আর আমিই রয়েছি অন্ধকারে।

লণ্ঠনের তলায় অন্ধকার হয়। খাস জোতের প্রজা হলে জানতে পারতেন।

তা বটে। মহারাণীর হুকুম তাকে খুঁজে বের করতে হবে। বলুন দেখি, কোথায় খুঁজতে যাই।

বেশি দূর যেতে হবে না। মহারাণীকে বলবেন, স্মৃতীশ পাশ করেছে, এবারও বৃত্তি পেয়েছে, কলিকাতার কোন কলেজে পড়ছে। স্মৃতীশ নিজে এসে এই সংবাদ দিয়ে গেছে।

এত গুলো সংবাদ তার অধীনস্থ দেবসেবার নায়েব জানে, অথচ সদরে পেশ করেনি। অসহিষ্ণু সদর নায়েব তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, এসব আমাকে জানান নি কেন?

প্রয়োজন হয় নি। দ্বিতীয়ত, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়।

সদর নায়েব অসন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে এসে স্মৃতীশ সম্বন্ধে সব সংবাদ পরিবেশন করে মন্তব্য বলল, প্যারীবাবু এ সব খবর জেনেও কাউকে বলেনি। বললাম, আপনাকে সব কথা জানান উচিত ছিল। সে জবাব দিল, এটা ব্যক্তিগত বিষয়, অন্তের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

মহারাণী হাসল।

একদিন স্মৃতীশও এই কথা তাকে বলেছিল। ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্তের হস্তক্ষেপ শুধু মহারাণী আর স্মৃতীশই অপ্রীতিকর মনে করে না, আরও অনেকে করে। মনে মনে খুশী হয়ে বলল, তাতো বুঝলাম। আপনার কাজ হল কোলকাতার বড় বড় কলেজ খুঁজে তাকে আমার সামনে নিয়ে আসা।

নিয়ে আসা বলাটা যত সহজ, আনা তত সহজ নয়। স্মৃতীশকে আবিষ্কার করতে বিলম্ব ঘটল না, কিন্তু রাজবাড়িতে পদার্পণ করবার ইচ্ছা

তার মোটেই নেই, এ কথা দৃঢ়ভাবে সদর নায়েবকে জানিয়ে দিল। এমন কি তার ঠিকানাও দিল না।

মহারাণী আদেশ দিল, ঠিকানা বের করতেই হবে। সদর নায়েব করিত-কর্মা লোক। সদর কাছারীর দারোয়ান উজবুগসিংকে কলেজের দরজায় বসিয়ে যথারীতি উপদেশ দিয়ে নিজে আত্মগোপন করে রইল। সন্ধ্যার সময় উজবুগ সিং যে ঠিকানা এবং বাসস্থানের বর্ণনা দিল তাতে সদর নায়েবের সংশয় উপস্থিত হল। পরদিন দুপুরে স্বয়ং গিয়ে আশে পাশের লোকের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হল, স্মৃতীশের বাসস্থান ঐ খোলার বস্তিতে।

প্রত্যেক রবিবারে প্রবীর আসে। আজও তার আসবার কথা। স্মৃতীশ কান পেতে রয়েছে। ঠুক্ করে শব্দ হলেই উঠে দেখছে। অধীর ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে, এমন সময় রাজবাড়ির ব্রুহাম এসে দাঁড়াল বস্তির দরজায়।

গাড়ির দরজা খুলে বের হল মহারাণী।

মহারাণী!

হাঁ, তোমাকে আবিষ্কার করলাম। কলম্বাস বলতে পার।

বাসস্থানের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই বাসস্থানই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছ বুঝি?

এর চেয়ে ভাল বাসস্থান সংগ্রহের সামর্থ্য নেই। অন্তত এখানে মনটা অশান্ত হয় না। ঝামেলার হাত থেকে বেঁচেছি।

বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় কি? বাঁচাটা নিজস্ব প্রচেষ্টা।

সহাস্যে স্মৃতীশ উত্তর করল, সেই প্রচেষ্টার অনুশীলন করছি।

মহারাণী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, পাশের খবরটাও তো দিতে পারতে?

স্মৃতীশ কুণ্ঠিত ভাবে বলল, ভয় হচ্ছিল, আবার যদি জড়িয়ে পড়ি। হয়ত, স্মৃতীশের কথা শেষ হল না। দরজা ঠেলে এসে দাঁড়াল প্রবীর আর বুলু। তাদের দেখে স্মৃতীশ স্মিতহাস্যে বলল, এই হল আমার সহপাঠী বন্ধু প্রবীর আর এই হল তার বোন বুলু। যে বুলুর কথা আপনি সিমলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর ইনি হলেন মহারাণী অবন্তী দেবী।

প্রবীর এবং বুলু একসাথে মুখ উঁচু করে বলল, মহারাণী।

মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে মহারাণী বলল, আশ্রিতজন তাই বলে। তোমরা কিন্তু তা বল না যেন। আমি তোমাদের মহারাণী নই, আমি তোমাদের মাসিমা।

মহারাণীর সহজ বচনভঙ্গীতে স্বতীশ অবাক হয়ে গেল।

কি ভাবছ স্বতীশ! নোংরা বস্তিতে নিজেকে টেনে এনে বুঝি পরখ করতে চাইছ, জীবনটা কত সুন্দর। সমন্বয় মন্দ নয়, রাজপ্রাসাদ থেকে একেবারে পর্ণকুটির। আমি কেন এসেছি জান?

ঠিক জানি না। রাজবাড়ির অনুগ্রহদান নিশ্চয়ই নয়।

রাজবাড়িতে অনুগ্রহ নেবার লোকের অভাব নেই। আমি জানতে এসেছিলাম, তোমার এত অভিমান কেন?

কেন তা আমি নিজেও জানি না, হয়ত কোন কমপ্লেক্স। কিন্তু আছি বেশ। আমার প্রতিবাসী দুজনের একজন মাদ্রাজী কুলি, অপর জন উড়িয়া পানওয়ালা। সামনে থাকে করাতকলের জমিরুদ্দি। আরও কত কে, সবাইকে জানি না। রাতের বেলায় মাতালের হাট বসে, দিনে কলতলায় আরম্ভ হয় মেয়েদের কলহ। এর চেয়ে সুন্দর জীবন কল্পনা করতে পারেন? নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

তবুও এই জীবনের মাঝে নিজেকে স্বেচ্ছায় টেনে এনেছ।

স্বতীশ উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিল বুলু। বলল, না আনলে রাজপদ-ধূলি পড়ত কি এই কুটিরে।

স্বতীশ ভয় পেল। মহারাণীর মেজাজকে সে ভাল করেই জানে। বুলুর কথায় আঘাত ছিল, হয়ত মহারাণী কটুকথা বলে বসবে। মহারাণী কিন্তু হাসল। বলল, যুক্তি দিয়ে মানুষ সব কাজ করতে পারে না মা। সব সময় দেবার মত যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলাফল তাই অনেক সময় মনে হয় দৈব। সেই দৈবকে স্বীকার করি বলেই এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।

স্বতীশ আশ্বস্ত হয়ে হাসল।

হাসছ কেন? যেদিন নিষ্কৃতির পথ খুঁজছিলাম, সেদিন পুত্রতুল্য তোমার কাছ থেকে শিখলাম ভালবাসতে। পেরেছি কি না, নিজেই পরখ করে দে যেখানে আমিত্ব, সেখানেই পরাজয়, সেই পরাজয়কে পরাজিত করতে এসেছি।

তিনজনেই স্তব্ধভাবে মহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অবাক হয়ে গেলে, নয় কি? যাক, আজ চলছি। আমার ওখানে তোমাদের তিনজনেরই নেমতন্ন রইল।

ধীর সংযত পদক্ষেপে মহারাণী বেরিয়ে গেলেন।

রুহাম বেরিয়ে গেল।

প্রবীর বলল, অদ্ভুত।

বুলু বলল, আশ্চর্য।

স্বতীশ মন্তব্য করল, স্বাভাবিক।

একদিন বুলু এসে বলল, আমার ফাইন্যাল হয়ে গেছে। ভাবছিলাম একটা কাজ চাই। অনেক খুঁজে পেতে একটা কাজ পেয়েছি। আমরা মহিলা সংঘ গড়েছি।

স্বতীশ বলল, মন্দ নয়। সভ্য সংখ্যা কত? পাঁচজন নিশ্চয়ই।

পাঁচ জনের বেশি বুঝি হতে পারে না?

পারে, হবে না। দরকারও নেই। একজন সভানেত্রী, একজন সম্পাদিকা, দুজন ফেষ্টুনধারিণী আর একজন চোং-আ ফুঁকানী। মোট পাঁচজন। আর দরকার কি।

সংঘ সমিতি আর দলের এই নির্মম ব্যাখ্যা বুলুর কাছে মন্দ লাগল না। বলল, তাই তুমি বুঝি রোল নম্বর সিক্স হওনি কখনও।

তা বটে। কিন্তু তোমার সংঘের কর্ত্তব্য এবং বক্তব্য এবং অন্যান্য 'তব্য' প্রত্যায়ন্ত বিষয়গুলো এবার বুঝিয়ে বল।

বক্তব্য নারী স্বাধীনতা, সমান অধিকার স্থাপন; আর কর্ত্তব্য একতা, নাগরিকবোধ জাগ্রত করা, স্বাবলম্বন ইত্যাদি ইত্যাদি, তার সাথে রইবে সংঘের মুখপত্র। উদ্দেশ্য আমাদের বক্তব্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

এতো রীতিমত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তারপর?

পত্রিকার জন্য স্বকলমে এবং বকলমে কিছু লিখে দিতে হবে।

নারী-স্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করছ, পুরুষদের লেখা দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব কেন করতে চাও?

স্বাধীন হবার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে পরাধীনতার গ্লানি

কিছুকাল বহন করতে হয় বই কি। দেশের লোকতো স্বাধীন হতে চাইছে। কিন্তু ইংরেজ জমিদারী ত্যাগের কিছুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, অথচ ইংরেজের পাঠশালে পড়ছি, কলকারখানায় কাজ করছি। তা বলে স্বাধীন হবার ইচ্ছাটাতো বাদ দিতে পারিনি।

স্বতীশ মৃদু হাস্যে মুখ ভরিয়ে বলল, তাই বুঝি পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়েও পুরুষকে বাদ দিয়ে চলতে পারছ না!

হয়ত তাই, কিন্তু অনেক দিন ভেবেছি, বাদ দেওয়া সম্ভব কিনা?

বোধহয় উত্তর খুঁজে পাওনি?

পেয়েছি, সে উত্তরটা সর্বজনীন নয়, ব্যক্তিগত তাই কাউকে তা বলতে চাই না।

কয়েক মাস পরে বুলু এসে জানাল, আসছে মাস থেকে তাদের পত্রিকা বের হবে, অতএব লেখা চাই।

স্বতীশ অনেক ভেবে চিন্তে বলল, লেখা হয়নি, তবে একটা কবিতা লেখা আছে। শুনবে সেটা? যদি চালাতে পার চালিয়ে দাও। আমারও পরীক্ষা সামনে, পরীক্ষার পর নতুন এনার্জি নিয়ে তোমার কাজ করে দেব।

বুলু উৎসাহিত ভাবে বলল, পড় তোমার কবিতা।

অনেক খুঁজে পেতে কাগজ বের করে স্বতীশ পড়ল:

জীবন জোয়ার স্তব্ধ যেদিন, ঘুরবে যেদিন স্রোতের বাঁক,
ভেসে আসা ফুলটি তখন কুড়িয়ে নেব, আজকে থাক।

বুলু বাধা দিয়ে বলল, বড়ই স্পেসিমিষ্টিক। চলবে না। নজরুলের মত, "বল বীর উন্নত মম শির" জাতীয় কবিতা চাই।

তা হলে মাপ করতে হল। লেখা আমাকে দিয়ে হবে না। এত দিন উদ্‌যান আর অন্নযানের খিঁচুড়ি পাকিয়ে হঠাৎ কবিতা লেখা সম্ভব নয়।

বুলু ফিরে গেল। মনঃক্ষুন্ন হয়েই ফিরে গেল।

নীতিশ মোক্তারি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেনি এবার আই-এ পরীক্ষা দিতে এল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার সুযোগ রয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিল স্বতীশ।

পরীক্ষা দিয়ে এসে নীতিশ বলল, পাশ বোধহয় হবে না।

স্মৃতীশ হাসল।

হাসছিস কেন ?

ফেল করা যাদের অভ্যাস তারা পাশের ভরসা করে না।

স্মৃতীশের বলার ভঙ্গীতে নীতিশ না হেসে পারল না।

বলল, আমাদের থার্ড পণ্ডিত পটলদার কথা মনে পড়ে ?

খুব। সে কি পাশ করতে আরম্ভ করেছে ?

অনেকটা। আন্দুরায়ের জাঙ্গাল আদ্দেকটা সাফ করা হয়ে গেছে। পটলদাকে দিয়েছি দু বিঘের মত জমি। বলেছি ফসল যা হবে সব তার। পটলদা কোদাল খোন্তা নিয়ে দিন দুই তিন জমি নেড়ে চেড়ে সরে পড়েছে। ইস্কুলে আমার সামনে সহজে আসত না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল পটলদা ?

আর ভাইটি বল না, বামুন কায়েতের ছেলের কি চাষার কাজ পোষায়।

তা বটে !

কদিন আগে শেষ রাতে পটলদার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে আসতেই বলল, তোমার বউদির পেট সরেছে। অর্থাৎ কলেরা।

ছুটলাম। ছোটাই সার। পটলদার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। সাত দিন যেতে না যেতে শুনছি এবার যোগ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পটলদা বোধহয় এবার পাশ করবে।

স্মৃতীশ ক্ষুণ্ণ ভাবে বলল, পটলদা নাকি সাত টাকা বেতন পায়।

নীতিশ হেসে বলল তা হলেও তো বাঁচত। সাত টাকা ও সাতবারে পায়। বাড়ি বলতে একখানা ঘর। বিছানা বলতে একখানা মাদুর আর তেল চিটে বালিশ।

পটলদা বাবার আবিস্কার। গ্রামের ছেলে সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়েছে, করুক একটা কাজ। বাবা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু পটলদার উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ছিল। শিক্ষকতা করতে করতে কর্মশক্তির মেরুদণ্ড বোধহয় ভেঙ্গে গেছে।

নীতিশ কামিজে মাথা গলিয়ে বের হবার উদ্যোগ করতেই স্মৃতীশ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ ?

কিছু কেনা কাটা করে আসি। আজ রাতেই ফিরতে চাই।

দাঁড়াও। বলে স্মৃতীশ বিছানার তলা থেকে একশত কুড়ি টাকা নীতিশের হাতে দিয়ে বলল, এই দিয়ে কেনা কাটা কর।

এত টাকা!

কাল একসাথে আট মাসের বৃত্তির টাকা পেয়েছি।

কিন্তু তোর চলবে কি করে!

টুইশনি, বুঝলে টুইশনি। তোমার এত ভাবতে হবে না। তোমায় কোন দিন কি প্রশ্ন করেছি, সংসার চালাবার টাকা তুমি কোথায় পাও? —আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পাবে না।

যাবার সময় নীতিশ বার বার করে বলে গেল, তার পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র সে যেন বাড়ি যায়। কোলকাতায় অতিরিক্ত একদিনও যেন সে না থাকে।

কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পর স্মৃতীশ বাড়ি যেতে পারল না। ইচ্ছা করেই সে কয়েক দিন এখানে ওখানে কাজের চেষ্টা করতে লাগল। প্রসাধন তৈরীর একটি কারখানায় কাজ পাবার আশা রয়েছে জেনে খুব সকালে প্রস্তুত হয়ে রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র পুলিশ তাকে আটক করল। বস্তির ঘরখানা তছনছ করে তল্লাসী করে তাকে নিয়ে গেল লালবাজারে।

স্মৃতীশ জানতে পেল না, কেন এই বন্দীত্ব। আইনের প্যাঁচে তার সুস্থ জীবন যাপনের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। কেউ বলল না, কি তার অপরাধ। এই সামান্য বিশ বাইশ বৎসরের স্বল্প জীবনে পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কাজে সে কখনও নিজেকে নিযুক্ত করবার অবসর পায়নি। অথচ বিধাতার নির্মম রোষে তার ভাগ্য লিখে নিল বন্দীত্বের গ্লানি। ভেবে সে ঠিক করতে পারল না, কোথায় তার অপরাধ। সে অপরাধের রূপই বা কি!

যথাসময়ে এ সংবাদ নীতিশের কাছে পৌঁছাল। মহারাণীর কাছেও সংবাদ পৌঁছাল।

নীতিশ এল সুখদাকে নিয়ে, দেখা করল জেলখানায়। চোখের দেখা মাত্র। সুখদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

স্মৃতীশ পরিণত বয়স্ক বৃদ্ধের গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বলল না, শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহারাণী এল উকিল কৌঁসুলী নিয়ে। দেখা হল জেলখানায়। সেও চোখের দেখা। মহারাণী কাঁদেনি, হেসে বলল, জীবনকে নানা ভাবে পরখ করতে চেয়েছে, এও এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপায়।

কৌঁসুলী জিজ্ঞাসা করল তোমার বিরুদ্ধে কি চার্জ?

আমি জানি না।

তুমি জান না? —পিকুইলিয়ার। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

আদালতে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচার আরম্ভ হল। স্মৃতীশ একা নয়, ভাল করে চেয়ে দেখল, চেনা মুখ মাত্র একটি। বিগত চার বছরের অভিন্ন হৃদয় বান্ধব প্রবীরও রয়েছে।

স্মৃতীশ আবেগের সাথে বলল, প্রবীর তুমিও?

আমিও তাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। তুমি আছ কোথায়?

হরিণবাড়ি। তুমি?

সিরাজ মহিষীর প্রাসাদে, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সীতে।

দিনের পর দিন বিচার চলল। অবশেষে বিচারকের দণ্ড নেমে এল। প্রমাণের অভাবে স্মৃতীশ এবং প্রবীর উভয়েই খালাস পেল।

আদালতের দরজায় প্রবীর স্মৃতীশকে জাপটে ধরল আকুল আগ্রহে।

ব্রুহাম থেকে নেমে এল অবন্তীদেবী।

স্মৃতীশ প্রণাম করল। এই তার জীবনে মহারাণীকে প্রথম প্রণাম।

প্রবীরও প্রণাম করল।

মহারাণী বলল, সত্যের জয় চিরকাল।

প্রবীর বলল, কিন্তু মাসিমা ক মাস ধরে ভেবেছি এই নির্বোধ শাসন ব্যবস্থায় কোন সভ্য প্রশাসন সম্ভব কি না? এই ব্যবস্থার স্থায়ীত্বের অর্থ সত্যের মৃত্যু। যাদের কখনও দেখিনি, যে কাজ কখনও করিনি, সরকারী ব্যবস্থায় দেখলাম, সে সব ব্যক্তি যেন আমাদের কত পরিচিত, সে সব কাজ করতে আমরা যেন কত অভ্যস্ত।

বাধা দিয়ে মহারাণী বলল, এটা জয়চাঁদ মীরজাফরের দেশ, একথা ভুলে যেও না। আবার একদিন দেখবে এরাই সমাজের মাথায় বসে আমার তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।

স্বতীশ সোজা এসে উঠল তার পুরাতন বস্তিতে। প্রবীর মহাবাণীর সাথে ফিরে গেল তার কাকার বাসায়।

তিন মাস ঘর ভাড়া দেওয়া হয়নি। ঘর বেদখল হয়ে গেছে। পাশের ঘরের মুন্নাস্বামী তাকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসি হেসে বলল, খালাস হলে।

হাঁ ভাই।

মুন্নাস্বামী পুলিশ সম্বন্ধে অশ্লীল কটূক্তি করে নিস্ফল আক্রোশে একবার হাত পা নেড়ে জানিয়ে দিল, সুবিধা পেলে পুলিশ নামক তার শ্বশুর পুত্রের উর্দ্ধতম কয়েক পুরুষের পিণ্ডদান অবশ্যই করবে।

স্বতীশ জিজ্ঞাসা করল, আমার ঘরে কে আছে?

আমারই বোনাই। তোমার দরকার হলে এখুনি ঘর ছেড়ে দেবে।

আমার আর দরকার নেই। আজই দেশে চলে যাব। যদি ফিরে আসি তাহলে তোমাকে বলব।

মুন্নাস্বামী উৎসাহিত হলনা। বলল, কেন আসবে না ভাই। আমাদের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি! চল একটু চা খেয়ে আসি।

নিকটেই রজু মণ্ডলের মোবাইল ক্যান্টিন। লোহার উনুনে পেতলের কলসী বসানো, কলসীর গলায় রাং ঝালাই করা চোঙ। সকালবেলা থেকে চা-পাতা সেদ্ধ জল আদা-চিনি-দুধ সহ গরম হতে থাকে কলসীতে। একহাতে উনুন সমেত কলসী, অপর হাতে চটের থলে ভর্ত্তি মাটির গেলাস, রজু সকাল থেকে তামাম বস্তি ঘুরতে থাকে। এক পয়সা আর দুই পয়সা রেটে চা বিক্রি করে। সন্ধ্যা বেলায় কিছুক্ষণের জন্য সাতাশ নম্বর বাড়ির সামনে বসে।

মুন্নাস্বামী স্বতীশকে টানতে টানতে সাতাশ নম্বরে নিয়ে এল।

দুটো চা দাও রজু ভাই।

স্বতীশকে দেখে রজু হাত তুলে নমস্কার করল, খুব তকলিফ হইলো বাবুজি?

না, এমন কিছু নয়।

চা খেতে খেতে মুন্নাস্বামী তার পারিবারিক সুখ দুঃখের অনেক কাহিনী শুনিয়ে কথা শেষ করল স্বতীশকে নেমতন্ন জানিয়ে।

আজ রাতে আমার ঘরে খেয়ে তবে দেশে যেও।

আমাকে এক্ষুনি বের হতে হবে। গাড়ি ভাড়ার টাকা আনতে হবে মুন্না ভাই। নইলে খেয়ে যেতে কোন আপত্তি ছিল না।

মুন্না কি যেন ভাবল, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার গাড়িভাড়া কত ?

সাড়ে তিন টাকার মত।

বিনীতভাবে বলল, এই টাকাটা আমি দিচ্ছি শ্রীস্বতীশ বাবু। দেশ থেকে ফিরে এসে শোধ দিও।

স্বতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি বাজার যাচ্ছি। তুমি আমার লুঙ্গিখানা পরে স্নান করে জিরিয়ে নাও, কেমন ? গাড়ির তো অনেক দেরী।

মুন্নার স্ত্রী তার ছোট্ট ঘরখানার এক কোণায় মাদুর পেতে দিয়ে স্বতীশকে বসতে বলে উনুনে আগুন দিতে গেল। স্বতীশ চিন্তার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

মুন্নাস্বামী বাজার করে এসে স্বতীশকে ঘুমন্ত মনে করে স্ত্রীর হাতে হাত মিলিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করতে বসল। রান্না শেষ করে স্বতীশকে ডেকে তুলে খাবার জায়গা করে দিল।

রওনা হবার সময় চারটি টাকা পায়ের কাছে রেখে মুন্নার স্ত্রী প্রণাম করল। বলল, ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা দিলাম বাবুজি।

অন্ধকার গলিতে স্বতীশ থমকে দাঁড়াল। চোখ বেয়ে প্রীতির অশ্রুধারা নামতে থাকে, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে আবার চলতে লাগল। এত আপন করে ভালবাসতে বোধহয় আর কেউ পারেনি। প্রয়োজনের দান অল্প হলেও বিরাট। আরও বিরাট কেননা এ দান সঙ্গতিহীনের দান।

গাড়িতে বসে স্বতীশ নিজের কাছেই নিজেকে লজ্জিত মনে করতে লাগল। প্রথম যেদিন সে বস্তিতে বাস করতে এল, সেদিনকার কথা আজও মনে আছে। তিন টাকা ভাড়া। কাঁচা মেঝে, স্যাতস্যাঁতে অন্ধকার আবহাওয়া, ছোট বাঁশের জানালা দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। উঠোনে চট টাঙ্গানো দুর্গন্ধময় বারোয়ারী পায়খানা, কলতলার হট্টগোল,—সব কিছু এক লহমায় দেখে নিয়ে স্বতীশ আতঙ্কিত হল। স্বেচ্ছায় এ জীবনকে সে ডেকে এনেছে, অথচ বিশ্বাস করতে পারছিল না আগামী দুটি বৎসর সে এখানে থাকতে পারবে কি না।

প্রথম রাতের অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট। জমিরুদ্দি মিস্ত্রীর ঘরের সামনে জুয়ার আড্ডা বসেছিল। হারজিতের খেলা শেষ হতেই মদের বোতল নিয়ে আরম্ভ হল মারামারি। অশ্লীল গালিগালাজ, জড়িত কণ্ঠের কুৎসিত ইঙ্গিত, —এ যেন নতুন জগত।

সকাল বেলায় ফাটা মাথায় পটি বেঁধে রাতের অত বড় হাঙ্গামাটা ভুলে যে যার কাজে বেরিয়ে গেল। কারুর মুখে শোনা গেলনা একটা আপশোষের কথা, কেউ কোন অভিযোগ জানাল না, কেউ আহা বলল না। আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল তার কাছে।

দুপুরে কলতলায় আবার হুল্লোড়। এবার পুরুষ নয়, মেয়ের দল। বস্তির গৃহিনীকুল। সাত হাত চার হাত ঘরের মালিকানি। কেউ শাড়িখানা কোমরে জড়িয়ে, কেউ শুধু পেটিকোট পরিধান করে, কেউ তিনহাতি গামছা নগ্ন দেহের ওপর জড়িয়ে সালঙ্কারে গালিগালাজে মেতে গেছে। জলের কলসী আর বালতি নিয়ে প্রথম স্থান লাভের চেষ্টায় ধাক্কাধাক্কি করছে। স্মৃতীশ চোখ বুঁজে না থাকলে নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় মাথা নীচু করতে বাধ্য হত।

এর মধ্যেই দুটো বছর কেটে গেছে। এই মানুষগুলির জীবনযাত্রা কোন-দিনই কোন রেখাপাত করতে পারেনি তার মনে। মাঝে মাঝে বিব্রতবোধ করত যখন স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক কলহে মধ্যস্থতা করতে তাকে ডেকে নিয়ে যেত।

মন শক্ত করে এই জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সে চেষ্টা করেছিল। এই জীবনের সাথে পরিচয় না থাকলে সত্যকার মানুষের সাথে পরিচয় কোনদিনই হয়ত সম্ভব হত না। শ্রেণীর তলায় শ্রেণী। একের পেষণে অপরে নিঃশেষিত, নুইয়ে পড়ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে, এটাইতো মানুষ গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের এ জীবন। জীবনকে বাদ দিয়ে কেউ চলতে পারে না। এরাই ধনবৈষম্যের নীচের তলার সিঁড়ি। পা ফেলতে হলে এদের মাথায় আগে পা দিতে হয়।

প্রথম দিনই মুন্নাস্বামীর সাথে তার পরিচয়। মাদ্রাজ উপকূলের কোন এক গোদাবরী জেলার তেলিঙ্গা। পিতার হাত ধরে ছ বছর বয়সে এসে উঠেছিল কলিকাতার বস্তিতে। ছয়ের পর ছত্রিশ পেরিয়ে গেছে, এদেশের

আদবকায়দা ভাষা রপ্ত করেছে। হাজার হাজার ঝড় ঝঞ্ঝা তুফান বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে, সব কিছু সইতে হয়েছে। ঘরও বেঁধেছে।

স্মৃতীশ তখন নতুন ভাড়াটিয়া। তার চালচলন লক্ষ্য করে বলেছিল, তুমি ভদ্দর লোক, এই বস্তিতে থাকতে পারবে না। ভাল দেখে অন্য কোথাও ঘর নাও।

তোমরা তো আছ?

আছি। মানুষ থাকে, কুকুর থাকে, জানোয়ার থাকে। সবার থাকা এক নয়।

স্মৃতীশ হেঁসেছিল।

তারপর দু বছর পাশাপাশি বাস করেছে। কোনদিন কোন অসুবিধা কেউ কারুর করেনি।

এইতো সেদিনেব কথা। পুলিশ যখন হাণ্ডকাফ্ তুলে দিল তার হাতে, প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল মুন্নাস্বামীর কণ্ঠে। বলেছিল, চোর নয়, ডাকাত নয়, গুণ্ডা নয়, ভদ্দর লোক, হাতকড়া দিও না।

তার প্রতিবাদ কেউ শোনেনি, কিন্তু প্রতিবাদের মাঝ দিয়েই তার প্রীতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

মুন্নাস্বামী কেঁদেছিল সেদিন। তার স্ত্রীও কেঁদেছিল। সেদিন কাঁদবার প্রয়োজন ছিল, কাঁদবার লোক ছিল না। অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতা দান করেছিল ওরা দুজনে।

রাতের বেলায় চুপি চুপি তাড়ি খেয়ে আসত মুন্না, স্ত্রী ঝঙ্কার দিত। স্মৃতীশ অনুযোগ করত, অনুরোধ করত। মুন্না ভাল মানুষটির মত শপথ করত, কিন্তু শপথ ভাঙ্গতেও দেরী হত না। সেদিনও স্মৃতীশ চিন্তা করছে, জীবনের সব সুখ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত মানুষ যদি উগ্র মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে না থাকে, অন্তত ক্ষণিকের জন্যও, তা হলে সে বাঁচতে পারে না। মুন্নাকে বাঁচতে হবে তো।

আজও মুন্নাস্বামী আর তার স্ত্রী হাপুস নয়নে কেঁদেছে। বিদায় জানিয়েছে। তার হাতে তুলে দিয়েছে হয়ত তার সারা জীবনের সঞ্চয়। বল্লোকের অধিবাসী সে নয়, আদর্শবাদী ত্যাগী পুরুষও নয়, অতি সামান্য একজন কুলি। সকাল বেলায় বাস্তব জগতের সাথে পরিচয় করতে চটের থলি জড়ানো ডালা মাথায় নিয়ে বাবুদের পেছন পেছন বাজারে ঘোরে। দু চার আনার বিনিময়ে মাল

পৌঁছে দেয় ধনীর প্রাসাদে। মেহনতের অনুপাতে মজুরীর স্বল্পতা তাকে ব্যথিত করে, হিংস্র করে তোলে না।

মুন্নাস্বামীকে ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী ছুটছে। অঝোরে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির সার্সি-গুলো বন্ধ করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে যাত্রীর দল।

স্মতীশ ঝিমুচ্ছে, ঘুম নেই চোখে।

কে যেন ডাকল, শীতু না?

স্মতীশ মুখ তুলে দেখল তারই সহপাঠী ব্রজবিহারী। একসাথে শিশুশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী অবধি পড়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করতে না পেরে পিতার ব্যবসা দেখাশোনা করছে আজকাল।

ব্রজবিহারী উঠে এসে তার পাশে বসল।

কোথায় যাচ্ছিস?

বাড়ি।

এবার তো বি-এস সি দিলি? তোরা ভাল ছেলে, স্কলার। তোদের কথাই আলাদা। আসছিস কোথা থেকে?

হরিণবাড়ি থেকে।

সে আবার কোথায়?

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।

জেল? কেন?

কেন তা জানি না। থাকতে হয়েছে, থেকেছি, থাকতে বাধ্য হয়েছি। ওরা বলল আমি রাজদ্রোহী, বিচারক বলল, না। তাই খালাস পেয়ে বাড়ি চলেছি।

ব্রজবিহারীর মুখের চেহারা বদলে গেল। উসখুস করতে করতে বলল, এক সাথেই তো যাচ্ছি। এখন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, কেমন।

স্মতীশ শুধু মাথা নাড়ল।

ব্রজবিহারী ভয় পেয়েছে। মুন্নাস্বামীর যেটুকু সাহস আছে, ব্রজবিহারীর তাও নেই। এদের পার্থক্য কোথায়?

প্রবীর মাঝে মাঝে বলত, যতদিন মানুষ বন্ধনহীন না হবে ততদিন দেশের উন্নতি নেই।

এ বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন। মানুষের বন্ধন ভূমির সাথে, পরিবারের সাথে, পরিবেশের সাথে, হাজারো বন্ধন মানুষের ; সেই বাঁধন ছিঁড়ে বের হতে না পারলে মানুষ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। এই বোধ হয় সত্য।

মুন্না মনে করে, তার বেপরোয়া জীবনই বাঁচার কষ্টি পাথর, তাই তার বন্ধনহীন ভালবাসা বিলিয়ে দিয়েছে। আর ব্রজবিহারী সতর্ক সাবধানী মানুষ। জীবনকে ভোগের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করে, সেই জীবনকে কোথাও কোন ক্ষয় ক্ষতির মাঝে সে আনতে চায় না, তাই আতঙ্ক তার বেশী। পরিচয় তার গৌন।

তার মনে পড়ল, মাঝে মাঝে রাজবাড়ির ব্রুহাম এসে দাঁড়ালেই মুন্না দৌড়ে আসত। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি রাজবাড়ি যাচ্ছ ?

স্মৃতীশ হেসে বলত, তোমাদের ছেড়ে যেতে পারছি কই ?

মুন্না প্রথম দিনেই জেনে নিয়েছিল ব্রুহামের হদিস। একদিন নিজেই উপযাচক হয়ে বলল, তোমার এত বড় রিস্তাদার, তুমি কেন এখানে থাক ?

স্মৃতীশ তার কথায় মোটেই আশ্চর্য হয়নি। মানুষের জন্মগত অভ্যাস ওপরের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলা, নীচের দিকে যারা তাকিয়ে দেখে তারা নির্বোধ। মুন্নাস্বামীর জন্মগত বৃত্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। তার কথায় প্রতিবাদ জানায় নি। স্মিতহাস্যে বলেছিল, তোমরা বুঝি আমাকে চাও না ?

মুন্না লজ্জায় উত্তর দিতে পারেনি।

মুন্নাস্বামী কিন্তু কোনদিন স্মৃতীশকে অনুরোধ জানায়নি, তার জন্য এই জাঁদরেল রিস্তাদারদের ঘরে রুটি রুজির ব্যবস্থা করে দিতে। হয়ত স্বাভাবিক ভাবে এই অনুরোধ এসে পৌঁছালে স্মৃতীশ নিশ্চয়ই মহারাণীকে অনুরোধ জানাত। মুন্নাস্বামী বোধহয় তা জেনেই কখনও নিজেকে ছোট করতে অপরকে ছোট হবার সুযোগ দেয়নি।

ট্রেণ চলছে।

বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতার ছবি গুলো ট্রেণের গতির সাথে মনের কোনে ছুটে আসছে। ট্রেণের মতই খটা খট্ শব্দ করছে। দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটার মত তোলপাড় করছে।

আরও পেছনে দুটো বছর থেকে গেছে। তোলযন্ত্রে ব্যবধান খুঁজতে

খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছে। দুই দুই চার। কোনটা ভাল, কোনটা ভাল নয়, বুঝতে পারেনি আজও।

ব্রজবিহারী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। স্বপ্নে বোধ হয় স্বদেশীওয়ালাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আনন্দে মসগুল হয়ে টাকার পাহাড় রচনা করছে।

অকস্মাৎ মনে প্রশ্ন জাগল, কেন তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। উত্তরও পেল, বৃত্তি আর বাসস্থানের অসামঞ্জস্যই সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ দিয়েছে।

আজ সে নতুন সমাজের লোক। যারা এত দিন সাহচর্য কামনা করেছে তারাই হয়ত দূরে সরিয়ে দেবে, তাকেও হয়ত নতুন সাহচর্যের অনুসন্ধান করতে হবে। নতুনের সন্ধানে বের হতে হবে।

নন্ পু-র-র। রাতের পোর্টার চিৎকার করল।

চমকে উঠে স্মৃতীশ নেমে পড়ল।

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক আগে। ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে শেষ রাতের একফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। স্মৃতীশ আকাশের দিকে উদাস ভাবে চেয়ে রইল।

সেই লাল কাঁকর বিছানো প্লাটফরম, সেই ধূমপূর্ণ কেরাসিনের বাতি, সেই কুণ্ডলী পাকানো কুকুর দম্পতি, সেই নিদ্রালু কনেষ্টবল। প্রতিবার একই দৃশ্য, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত, কোন পরিবর্তন নেই।

রামভরছ ঘোণ্টা লাগাও।

সেই চির পরিচিত আদেশ।

আরও সাতটা বছর পেরিয়ে গেছে।

সাত বছরে সারা দুনিয়ার চেহারা পালটে গেছে। নীতিশ কোন ক্রমে বি-এ পাশ করে দক্ষিণ ভারতে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সঙ্গে গেছে সুখদা আর শেফালি। স্মৃতীশ এম-এস-সি পাশ করে গ্রামেই ফিরে এসেছিল। শ্যামলীর বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে স্মৃতীশ আন্দুরায়ের জাঙ্গাল নিয়ে মেতে উঠল।

নীতিশ বারবার নিষেধ করেছে। বলেছে, ঐ জাঙ্গাল কারুর সহ্য হয় না শীতু। ওটায় হাত দিস না। আন্দুরায়ের সহ্য হয়নি, আমার বাবার সহ্য হয়নি, আমিও সহ্য করতে পারি নি, এমন কি থার্ড পণ্ডিত পটলদাও সহ্য করতে পারেনি। তুই ওতে হাত দিস না।

স্মৃতীশ নীতিশের উপদেশ শুনেছে, তার যৌক্তিকতা স্বীকার করেনি।

· কিন্তু একদিন তাকেও গ্রামে ছেড়ে আসতে হল। আম্মুরায়ের জাঙ্গাল স্মৃতীশেরও সহ্য হল না।

দলে দলে নরনারী নয়নার হাঁটু জলে নৌকা ভাসিয়ে গঙ্গায় এসে আশ্রয় খুঁজেছে, জলঙ্গীর চরে ঘর বেঁধেছে। ওপারের মানুষ এপারে আসছে, এপারের মানুষ ওপারে যাচ্ছে। মানুষের দুষ্ট নীতি দিয়ে সমাজ বিবর্তনের কৃত্রিম রেখা টানা হয়ে গেছে। মেকি রেখার এপারে ওপারে সঞ্চরণশীল মানুষের দল জোয়ারের স্রোতে ওঠা নামা করছে।

মুর্শিদকুলীর মৃত আত্মা কবরে আঁতকে উঠেনি, জাফরগঞ্জের সমাধিতে সিরাজ-লুৎফা শিউরে উঠেনি, নকীব আর হীরাঝিলের প্রাসাদে পুকার ছাড়ে নি, শুধু মীরজাফরের প্রেতাত্মা অট্টহাস্যে ভরিয়ে তুলেছে আকাশ বাতাস, সন্ত্রস্ত নরনারী ছুটছে নিরাপত্তার আশায়।

ধর্মের দোহাই দিয়ে ভাই ভাইকে দূর করে দিচ্ছে পিতৃপুরুষের বাসস্থান থেকে। শ্রেণী স্বার্থ নয়, বর্ণ স্বার্থ নয়, স্বার্থ রয়েছে অজ্ঞাত ঐশী শক্তি সম্বন্ধে বিকৃত চিন্তাধারায়। এই বিকৃত চিন্তাধারা স্মৃতীশের গ্রাম গড়বার, দেশ গড়বার সুষ্ঠু চিন্তাধারাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পথের সন্ধানে গৃহহারা করেছে। লক্ষ লক্ষ আশ্রয় ভিখারীর মত নয়নার মায়া কাটিয়ে স্মৃতীশও বেরিয়ে পড়ল আশ্রয় সন্ধানে।

সেই জন স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্মৃতীশকে আসতে হল কলিকাতায়।

এ কলিকাতা আর সে কলিকাতা নয়।

মানুষ, মানুষ আর মানুষ। হাহাকার আর আর্তনাদ। বেদনা আর লাঞ্ছনা। দর্শক রয়েছে, সমবেদনা নাই, অনুকম্পা রয়েছে হৃদয় নাই।

এসে উঠল প্রবীরের বাসায়।

প্রবীর কলেজে গেছে, বুলু গেছে স্কুলে, লতিকা বই নিয়ে কেবল দরজায় পা দিয়েছে, এমন সময় স্মৃতীশ এসে দাঁড়াল দোর গোড়ায়।

আনন্দের আতিশয্যে লতিকা বই ছুড়ে ফেলে স্মৃতীশকে অভ্যর্থনা জানাল।

কেমন আছ লতু?

মন্দ নয়। আপনার চেহারা এমন কেন শীতু দা। খুব অসুখ হয়েছিল বুঝি? কোথা থেকে আসছেন? সাথে কেউ আছে? কতদিন পরে দেখা?

স্বতীশ হেসে বলল, অত গুলো প্রশ্নের জবাব এক সাথে দেব কি করে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কর, আস্তে আস্তে উত্তর দিচ্ছি।

একটু খানি থেমে বলল, রাত জেগে দেশ থেকে একাই আজ এই মাত্র কোলকাতায় এসেছি। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তো ?

লতিকা ব্যস্ততার সাথে বলল, তা হলে খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই হয়নি। আপনি স্নান করে নিন, আমি খাবার জোগাড় দেখছি।

তুমি যে বের হচ্ছিলে।

না হলেও চলবে। একদিন কলেজ কামাই হলে বেদ অশুদ্ধ হবে না। দাদা কলেজে চাকরি পেয়েছে, সেও বেরিয়েছে, দিদি তো অনেক দিন ইস্কুলে কাজ করছে, সেও বেরিয়েছে।

আর আমিও বের হয়েছি। কেন জান ?

জানি। পাকিস্তান হয়েছে বলে।

স্বতীশ হাসল। লতিকার দেখবার মত চোখ থাকলে দেখতে পেত এ হাসির রূপ কান্নার চেয়ে হৃদয় বিদারক।

স্বতীশ অস্ফুট ভাবে কি যেন বলল, লতিকা শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছেন শীতুদা ?

স্বতীশ মৃদুকণ্ঠে বলল, এবার তোমার কোন ইয়ার ?

শেষ ইয়ার অর্থাৎ সিক্সথ ইয়ার। আপনি বসুন, আমি খাবার জোগাড় করি।

লতিকা গৃহ কর্মে লেগে পড়ল।

স্বতীশ স্নান করে আসা মাত্র খাবারের থালা এনে সামনে রেখে লতিকা বলল, কেমন ডিউটিফুল দেখুন।

স্বতীশ শুধু হাঁসল।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল- প্রবীর কখন ফেরে ?

সাধারণত তিনটের মধ্যেই ফেরে।

ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি কেমন, তুমিও দু একটা ক্লাশ করে আসতে পার।

তা মন্দ নয়। বেশ তাই করুন।

স্বতীশ বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না দিতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। লতিকা দরজা ভেজিয়ে রেখে রওনা হল।

প্রবীর বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতেই দেখে স্মৃতীশ তার বিছানায় শুয়ে আছে। ধাক্কা দিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করল, কখন এলি?

এগারটায়।

হঠাৎ?

দেশে থাকতে পারলাম না। চেষ্টা করেছিলাম যথেষ্ট, কিন্তু শাসকমণ্ডলী প্রতিজ্ঞা করেছে বুদ্ধিজীবী ভিন্নধর্মীকে তাড়াতেই হবে। তারই ফল ভোগ করছি। হয়ত বহুকাল ভুগতে হবে।

বেশ।

কি বেশ, বলতে বলতে বুলু ঘরে ঢুকেই স্মৃতীশকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই সামলে নিয়ে বলল, ঋষি মহারাজ তপোবন ত্যাগ করে হঠাৎ?

স্মৃতীশ হাসল।

তপোবনের প্রতিবেশীরাও শত্রু। তাই বুঝি শত্রুহীন দেশে পালিয়ে এলে?

এবারও স্মৃতীশ হাসল।

নে থাম দেখি, একটু চায়ের জোগাড় কর। বলে প্রবীর তাড়া দিল।

বাব্বা। বন্ধু না হয় তোমার একার, আমাদের কি কোন অধিকারই নেই।

অধিকার! বলে স্মৃতীশ গম্ভীর ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাটা যে অদ্ভুত ভাবে কানে এসে লেগেছে, বুলু নিজেও তা বুঝল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

রাতের বেলায় দুই বন্ধুতে খেতে খেতে গল্প করছিল। মাঝে মাঝে বুলুও তাতে যোগ দিচ্ছিল।

হঠাৎ প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, কি করবে ঠিক করলে?

কিছুই ঠিক করিনি। ভাবছি দাদার কাছে যাব। সেখান থেকে ফিরে যা হয় করা যাবে।

স্মৃতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চলনা আমরা সবাই একবার বেড়িয়ে আসি। ছুটি নাও ক'দিনের।

মন্দ নয়। তুই কি বলিস বুলু?

বুলু মাথা নেড়ে সায় দিল, বলল, ভালই তো।

আমার ইচ্ছা ছিল, না থাক। স্মৃতীশ বলা শেষ করল না। আবার বলল, সেখানে গিয়েই সব ঠিক করব। কেমন?

লতিকা পরিবেশন করছিল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শেষের কথা কটা তার কানে গেল, বলল, কোথায় গিয়ে শীতুদা ?

আমার দাদার কাছে, পুনায়।

সেখানে বুঝি যাচ্ছ।

আমি একা নই। আমরা সবাই, অর্থাৎ আমি, তুমি, প্রবীর এবং বুলু। যাবে তো ?

নিশ্চয়ই।

প্রস্তুতির আনন্দে দিনগুলি কখন যে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেল তা কেউ-ই বুঝতে পারল না।

দু তিন দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে তারা রওনা হল মারাঠাদের দেশের পথে।

তৃতীয় দিবসে এসে নামল পুনায়। আগে কোন খবর দেওয়া ছিল না। সেজন্য বাড়ি খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হল।

রবিবার পেথের ষোল নম্বর বাড়ির সিঁড়ির মুখে তখন দাঁড়িয়ে ছিল সুখদা। চারজন উঠে এসে প্রণাম করল তাকে।

সুখদা কল্পনাও করেনি স্মৃতীশ সদলে এসে হাজির হবে। অপরিচিত মুখগুলো পরিচয় দেবার প্রত্যাশায় এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই আকুল আগ্রহে সবার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করল অতি মৃদু কণ্ঠে।

স্মৃতীশ বলল, আমার মা।

মা। প্রবীর আবার প্রণাম করল। সাথে সাথে বুলু ও লতিকা প্রণাম করল।

ছুটে এল শেফালি। ছোড়দাকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। পরিচয়ের উত্তেজনায় নিজেকে কেমন যেন সে হারিয়ে ফেলল তখনকার মত।

কদিনেই পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নেবার সার্থকতা উপলব্ধি করে অপ্রীতিকর অনুষ্ঠান বর্জ্জন করে সহজ সরল ভাবে চলতে আরম্ভ করল। শেফালি এবং সুখদাকে রান্নাঘর থেকে বিদায় দিয়ে পর্যায়ক্রমে লতিকা এবং বুলু রন্ধনের দায়িত্ব গ্রহন করল।

বুলু মাঝে মাঝেই সুখদাকে বলত, আমরা শুধু স্কুল কলেজেই পড়িনি, চাকরিও করতে পারি রাঁধতেও পারি।

সুখদা আপ্যায়িত ভাবে হাসত। আশীর্ব্বাদ করত, সুখী হও।

সুখ কারও একচেটিয়া নয়, সুখহানির সম্ভাবনা দেখা দিল শীঘ্রই।

প্রবীর নোটিশ দিল, এবার ফিরতে হবে।

নীতিশ বলল, অবশ্যই, তবে বিলম্বে।

স্মতীশ সুখদাকে অন্তরালে ডেকে বলল, লতুকে আটকে রাখ মা।

সুখদা হতাশ ভাবে বলল, লতুতো আমার কেউ নয়।

কেউ করে নাও।

তুই কি বলতে চাস?

দাদার সাথে লতিকার বিয়ে দাও, আর প্রবীরের সাথে শেফালির।

চাইলেই তো হয় না বাবা। ওদেরও তো ইচ্ছা আছে, আত্মজন রয়েছে, তাদের মতামতও দরকার।

ইচ্ছে থাকলেই পথ হয়।

তখনকার মত আলোচনা চাপা রইল। রাতের বেলায় সুখদা উসখুস করতে লাগল। সুযোগ বুঝে নীতিশের কাছে কথাটা তুলবার ইচ্ছা নিয়ে চুপ করে পেছনের বারান্দায় শুয়ে রইল।

নীতিশ রাতে সামনের বারান্দায় শোয়। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সুখদা এসে পাশে বসল।

কিছু বলতে চাও মা?

বলছিলাম, লতুরা চলে যাবে।

তাতো জানি। যে যাবে তাকে আটকাবে কি করে?

শুনলাম, আগামী কার্তিকে লতুর এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হলে আবার ওকে আনিয়ে নেব। আমার কাছেই থাকবে।

এম-এ পাশ মেয়ে তোমার কাছে থাকবে কেন, সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে, দরকার হলে তুমি-ই গিয়ে থাকতে পারবে তার কাছে।

সুখদা চুপ করে বসে রইল!

নীতিশ অসোয়াস্তি অনুভব করতে করতে বলল, আর কিছু বলবে?

শেফালির সাথে প্রবীরের সম্বন্ধ করলে কেমন হয়?

কেমন হয়? —বলেই নীতিশ চুপ করে গেল। পাশ ফিরে বলল, শীতুকে একথা জিজ্ঞেস করলেই পারতে, আমার বিষয় হলে আমি বলতে পারি।

তোর বিষয়ও ভেবেছি। আমার ইচ্ছে লতুর সাথে তোর ব্যবস্থাটাও হয়ে যাক।

নীতিশ গম্ভীর ভাবে বলল, আমি তোমার ছেলে। তোমার মনে কষ্ট দেবনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেজন্য তোমার আদেশ হলে তা মান্য করবই। কিন্তু লতিকা এবং প্রবীরের মত, বিশেষ করে বুলুর মত জানা প্রয়োজন। আমার মতও নেই, অমতও নেই। তুমি সুখী হলেই আমি সুখী।

সুখদা স্মৃতীশকে সংবাদটি পরিবেশন করে স্মৃতীশের মতামত জানতে চাইল। স্মৃতীশ কোন মতামত না দিয়ে বলল, তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যা করবার আমিই করব।

পরদিন বিকেল বেলায় সুখদা আর লতুকে বাসায় রেখে প্রবীর, বুলু এবং শেফালিকে নিয়ে স্মৃতীশ বেড়াতে গেল পার্বতীর মন্দিরে।

মন্দিরের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বুলুর দিকে চেয়ে স্মৃতীশ ডাকল, বুলু।

বুলু কাছে আসতেই স্মৃতীশ বলল, আমরা লাফাতে লাফাতে উঠতে থাকি, প্রবীর আর শেফালি ধীরে ধীরে আসুক। কেমন ?

বুলু সানন্দে স্মৃতীশের সাথে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রবীর আর শেফালি অনেক নীচে গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে আসছে।

উপরে এসে চবুতারার এক কিনারায় দুজনে বসল।

স্মৃতীশ বলল, লতুর সাথে দাদার বিয়ে দিতে চাই। দাদা অমত করেনি।

স্মৃতীশের আগ্রহপূর্ণ অবতারণার উত্তরে নিস্পৃহ ভাবে বুলু বলল, কিন্তু লতু যদি অমত করে।

তবুও স্মৃতীশ উৎসাহভরে বলল, সেইজন্যই লতুকে বাড়িতে রেখে এসেছি। দাদা বাড়ি এসে তাকেই পাবে। মা রয়েছে, সে লক্ষ্য করবে হাবভাব।

দুষ্টু বুদ্ধিতে তুমি কম নও। আমিও দেখছি দাদার সাথে শেফালির কতটা মিল হয়। জানইতো মাষ্টার মানুষ, বড়ই খুঁতখুঁতে হয়। হয়ত মনে মিলল, রূপে মিলল না, রূপে মিলল তো সাইজে মিলল না, বলেই বুলু হো-হো করে হেসে উঠল।

তা হলে মনে করতে পারি এ যোগাযোগ নিষ্ফল হবে না।

আশা তো করছি। চল, ওখানে কেমন দোপাটি ফুটছে, তুলে আনি।

কি হবে ?

কি হবে না ? মালা গাঁথব, মাথায় পরব।

অনিচ্ছার সাথে স্মৃতীশ বলল, চল।

যেতে যেতে বুলু বলল, সবইতো হল, ঋষি মহারাজ কি করবেন ?

স্মৃতীশ লজ্জিতভাবে বলল, খোঁচা না দিয়ে কি কথা বলতে পার না। ঋষি হবার সৌভাগ্য যেদিন হবে,—

সেদিন আর কোন নারী তোমার সঙ্গে হাঁটবে না, এই তো ?

স্মৃতীশ হাসল।

হাসছ ? বেশ। কিন্তু ঋষি হলে পস্তাতে হবে।

সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।

তোমার মহিলা সংঘের কথা জিজ্ঞেসই করিনি। তার অবস্থা কি ?

মহিলা সংঘ ছেড়ে দিয়েছি।

কেন ?

ঠিক যেন ওটা পথ নয়।

অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

না মশাই, না। আসলে পৃথিবীতে দুটো মাত্র জাত আছে। এক জাত পুরুষ আরেক জাত মেয়ে। সৃষ্টির দিন থেকেই এদের স্বাতন্ত্র স্থির হয়ে গেছে। মেয়েদের স্বাধীনতা শাশ্বত, পুরুষের কাছ থেকে তা ভিক্ষা করে নিতে হয় না। পুরুষ শুধু দুর্বলতার সুযোগ নেয়। দুর্বলতা জয় করতে পারলে স্বাধীনতার জন্য আবেদন জানাতে হয় না। কিন্তু,

কিন্তু কি ?

কিন্তু যেখানে মানুষ হয়ে রয়েছে অকর্মণ্য সেখানে তাকাবার অবসর আমরা পাইনা। অপরকে বঞ্চনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে চেষ্টা চলে আসছে আবাহমানকাল, তাকে পরাজিত করতে পারিনি আমরা কেউ-ই। পারিনি অর্থনৈতিক যোগ্যতা সৃষ্টি করতে এবং অনুপাত আদায় করতে। এই যোগ্যতা এবং অনুপাত উপার্জন করতে হয়, ভিক্ষায় তা পাওয়া যায় না। মহিলা সংঘ তা করতে পারবে না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

স্বতীশ ভাবালুর মত ডাকল, বুলু।

কেন ?

মানুষ তো বেশি চায়। সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার বোধহয় একটা মিটার আছে। সেই মিটারের দাগে দাগে মিলে গেলে সাধারণ মানুষ প্রশান্ত হয় কিন্তু সেইটুকু পায়না বলেই মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সমাজের বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমরা বাস করছি সমাজ বিহীন সমাজে। মানুষ এখানে ক্রুর, বঞ্চক, তঞ্চক, আরও কত কি। কিন্তু এর সমাধান কোথায় বলতে পার ? যা বলবে তার বাস্তব প্রয়োগ কতদুর অবাস্তব তা ভেবে দেখেছ কি ? মানুষ জন্মায়, জন্ম দেয় ; বাঁচে বাঁচায়। এর বেশি আর কিছু নেই। আদিম যুগ থেকে, গুহামানবের যুগ থেকে মানুষ একই পথ ধরে চলেছে। পথের বিপনির সজ্জা বদলাচ্ছে, কিন্তু পথ বদলায়নি। সজ্জার জৌলুসে মানুষ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও সহজাত বৃত্তিকে তো ভুলতে পারেনি। তাই কাউকে অস্বীকার করে অপরে বাঁচতে পারে না। হয়ত অতৃপ্ত আকাঙ্খা উপার্জ্জনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। নির্বাক বিস্ময়ে হতভম্ভ মানুষ ভিক্ষাকেই মনে করে আশ্রয়।

তা হলে তুমি বলতে চাও সমাধান আসবে না ?

আসবে, কিন্তু তার প্রস্তুতি চাই। মহারাণীকে দেখেছ ? তাকে দু বছরেও বুঝতে পারিনি, তাই শ্রদ্ধা জানাইনি। কিন্তু যেদিন আদালত থেকে বেরিয়েই তাকে সামনে পেলাম, সেদিন তার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম জানিয়ে ছিলাম। কেন জান ? সেদিন মহারাণীকে পেয়েছিলাম মহারাণীর অনেক উচ্চে, অবন্তী-দেবী রূপে। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার হয়েছিল। দু চারজন নিয়েই যদি আমাদের দেশটা গড়ে উঠত তা হলে ভাববার ছিল না, কিন্তু অসংখ্য মানুষ রয়েছে, রয়েছে তাদের অজ্ঞতা, রয়েছে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, রয়েছে বীরপূজার ঐতিহ্য, রয়েছে ধর্মের অনুশাসনের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস, একদিন একটি আঘাতে এসব লোপাট করে দিতে পারবে কি। একটা পুরাতন বাড়ি ভেঙ্গে ইমারত গড়তেও তো সময় দরকার হয়। সেটুকু অবসর সমাজকে দিতে হবে, নইলে তোমার প্রাপ্য আদায় হবে না, যা পাবে তা হবে ক্লেদ।

তারজন্য বহু বর্ষের সাধনার প্রয়োজন রয়েছে বলতে চাও ?

বটেই তো। তাতে দুঃখ নেই। মানুষতো মরে না। মানুষ বাঁচতে চেয়ে অপরকে বাঁচার রাস্তা খুলে দেয়। নইলে আজও আমরা পঙ্গু না হয়ে

পায়ে ভর দিয়ে চলছি কি করে। যাক, ওসব কথা। প্রবীর আর শেফালি এসে গেছে। তুমি ওদের মনের কথাটা জেনে নিও।

আরও মানুষতো রয়েছে, তাদের মনের কথা জানবার বুঝি দরকার নেই।

স্মৃতীশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বুলুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, একি তোমার মনের কথা।

বুলু উত্তর দিতে পারল না। আবেগের অতিশয্যে যা বলেছে তা ফিরিয়ে নেবার পথ নেই। চোখ মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রইল।

স্মৃতীশ খিন্নভাবে বলল, আমরা যে দিতে এসেছি, পেতে আসিনি। যেদিন পাবার সময় হবে সেদিন কারও প্রতীক্ষা করতে হবে না। মনে আছে সেই যে কবিতা, সেই কবিতা দিয়েই তো আমার কথা বলা শেষ হয়ে গেছে।

কথা শেষ হতে না হতে শেফালি আর প্রবীর এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। অনু-যোগের সুরে শেফালি বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক, আমাদের ফেলে পালিয়ে এলে।

বুলু কথা না বলে হাসল। শেফালির গৌরবর্ণ মুখখানায় সিঁদুরের ছোপ পড়ল। প্রবীর আত্মরক্ষার তাগিদে হঠাৎ বলবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে স্মৃতীশের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল পার্বতী মন্দিরের সামনে।

বুলু শেফালিকে একলা পেয়ে খুশী হল। বলল, চল শেফালি ফুল তুলে আনি। কেমন পাহাড়ের গায়ে লাল সাদা দোপাটির ঝোঁপ। এমন সুন্দর ফুলের কেয়ারি কখনও কলকাতায় দেখিনি।

বুলুর প্রস্তাবে শেফালি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দুজনে এগিয়ে গেল কেয়ারির দিকে। বুলু বলল, তুমি আঁচল পেতে ধর আমি তুলতে থাকি।

বুলু একগাদা ফুল তুলতেই শেফালি বলল, এত ফুল দিয়ে কি হবে বুলুদি?

বুলু দুষ্টুমি ভরা চোখে হাসির ঝিলিক, শেফালির কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমার দাদাকে কেমন মনে হল শেফালি?

বুলুর এই প্রশ্নের জন্য শেফালি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই বোধহয় জবাব খুঁজে না পেয়ে এক মুঠো দোপাটি আঁচল থেকে তুলে নিয়ে বার বার সেই দিকেই তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বুলু কৌতুকভরে আবার জিজ্ঞাসা করল, আমার কথার জবাব দিলে না তো?

সলজ্জ শেফালি সব শক্তি সংগ্রহ করে বুলুর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, আমার ছোড়দাকে তোমার কেমন মনে হল বুলুদি?

প্রথমে বুলু একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, যখন বুঝল বৈষয়িক বুদ্ধিটা তার নিজস্ব নয় এবং একচেটিয়া নয় তখন হো-হো করে হেসে উঠল। বুলুর হাসির ধাক্কায় শেফালির কর্ণমূল অবধি রাঙা হয়ে উঠল। বুলুর হাসি থামতেই শেফালি বলল, তোমরা তো বল, তোমার দাদা কলেজে মাষ্টারী করে, আমি দেখলাম, সে মাষ্টারী করে বোবা ইস্কুলে।

আর তুমি ?

আমার তো গেঁয়ো, চিরকাল বোবা ইস্কুলের ছাত্রী।

তা হলে পাঠ সমাপন এবার বোধহয় করে নিতে পারবে।

শেফালি বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে বলল, এত ফুল কি হবে ?

বুলু গম্ভীর ভাবে বলল, সাজব আর সাজাবো।

কাকে ? পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করল স্মৃতীশ।

মুখ ফিরিয়ে স্মৃতীশকে দেখতে পেয়ে বুলুর কলকণ্ঠ কেমন যেন থেমে গেল আপনা থেকেই। একটা কঠিন কথা তার মুখে এসে আটকে গেল। অনেক কষ্টে আত্ম সম্বরণ করে বলল, ঋষি মহারাজকে নিশ্চয়ই নয়। কথাটা বলেই বুলু থমকে গেল।

স্মৃতীশের থম থমে মুখের দিকে চেয়ে বুলু বলল, রাগ করলে ?

রাগ! না, ভাবছিলাম, তুমি অতো সহজে কি করে ছেলে মানুষের মত মন্তব্য কর।

আচ্ছা বলতে পার, আমাদের মধ্যে বার্দ্ধক্য কার এসেছে ? জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে যারা ইঙ্গিত দেয় তারা ছেলেমানুষ কখনও হতে পারে কি ? বরং যারা তা স্বীকার করে না তারাই শিশু।

স্মৃতীশ বলল, ইঙ্গিত যদি ব্যঙ্গ হয়।

ব্যঙ্গ কিন্তু সহজাত কিছু নয়, ব্যঙ্গ হল নৈরাশ্যের একটা দিক, যা রূপলাভ করে গোপন ইচ্ছার সংঘাতে। আর দরকার নেই, এখন চল, তোমার বন্ধু, যাকে শেফালি বলেছে বোবা ইস্কুলের মাষ্টার সে এসে গেছে। কদিন পরে হয়ত শেফালি হাঁপিয়ে উঠে বলবে, তোমার দাদার জিহ্বা সংযত করতে বল।

প্রবীর আসতেই চারজনেই আবার সিঁড়িতে পা দিয়ে উৎরাইয়ের পথ ধরল। সবাই তখন ফিরতে ব্যস্ত, কলকণ্ঠ তখন নিস্তব্ধ।

৮

অগ্রান মাসে নীতিশ এবং শেফালিকে নিয়ে সুখদা কলিকাতায় এসে প্রবীরের বাসায় উঠল। উদ্যোগ আয়োজন স্মৃতীশ সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। অনাড়ম্বরে দুইটি বিবাহের হাঙ্গামা মিটে গেল।

একদিন বুলু নিভৃতে স্মৃতীশকে জিজ্ঞাসা করল এবারতো সবাই হাত পা ঝাড়া হলাম। এখন কি করবে?

'সবাই' বলতে যে বুলু এবং স্মৃতীশ ভিন্ন আর কেউ নয়, একথার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল না। স্মৃতীশ মৃদু কণ্ঠে বলল, বেসরকারী কলেজে চাকরি পেয়েছি, এবার কাজে যোগ দেব। আর তুমি?

আমার কাজ তো রয়েছেই। এবার কিন্তু বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ হবে।

কেন? শেফালি রইল, প্রবীর রইল।

বুলু হাসল। ম্লান এই হাসির পশ্চাতে বুভুক্ষু মনের অপরিতৃপ্তির মলিন রেখা ফুটে উঠল। বলল, আমি হোস্টেলে থাকব।

স্মৃতীশ আর প্রশ্ন করল না। বুলুর বক্তব্য স্পষ্ট না হলেও অর্থ স্পষ্ট।

সকাল বেলায় নীতিশকে লতিকা এবং সুখদার সাথে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে স্মৃতীশ বুলুকে ডাকল। বুলু তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। ডাক শুনে বুলু তার সামনে আসা মাত্রই স্মৃতীশ বলল, কাপড়টা বদলে নাও, চল একবার আমার পুরাতন আস্তানা বেরিয়ে আসি।

স্কুলের বেলা হয়ে যাবে, তার চেয়ে বিকেলে গেলে হয় না?

স্মৃতীশ পকেট থেকে অতিজীর্ণ একখানা চিঠি বের করে বুলুর হাতে দিয়ে বলল, দেখত কোন্ তারিখের চিঠি। একমাস হয়ে গেছে, নয় কি? দেশ থেকে এসে যখন তোমাদের এখানে উঠেছিলাম তখন তাকে ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। এতদিন চিঠি কারুরই চোখে পড়েনি। মায়ের বিছানা বাঁধতে গিয়ে তোমাদের বইয়ের সেলফের তলায় আজই পেয়েছি।

চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে বুলু কাপড় বদলে এল। স্মৃতীশ জিজ্ঞাসা করল, কিছু টাকা নিয়েছ কি?

বুলু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জুতোয় পা গলিয়ে দিয়ে বলল, চল।

সাতাশ নম্বর বস্তি। সেই খোলার বাড়ি। পাঠ্যজীবনের অমূল্য চারটি বছর কাটাতে হয়েছে এই বস্তির অসহনীয় পরিবেশে। সুদীর্ঘ চারিটি বৎসরের প্রতিবেশি মুন্নার চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছে তাকে দেখতে। কোন দিন যে লোকটি সামান্যতর সাহায্যের প্রত্যাশায় আবেদন জানায়নি, সেই লোকটির কাতর আবেদন ফুটে উঠেছে একটি কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে। কোন প্রতিবেশির কিশোরকে ডেকে মুন্নার স্ত্রী চিঠিখানা লিখিয়ে নিয়েছিল, কচি কাঁচা হরফে, বোধহয় তাতেই বিশ্বের সকল বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্মৃতীশ ভেবে পেল না, এই সেই মুন্না কিনা, একদিন যার ঘরে বসে ইডলী-ধোসা খেয়েছে। বসে বসে তার কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছে। মুন্না তাকে ছাড়তে চায়নি। অথচ কৃতিত্বের ছাপ নিয়ে সে নিজেই মুন্নাকে ছেড়ে এসেছে। চলাচলের পথে সাময়িক পরিচয় থিতিয়ে গেছে মনের কোনে। সবার অজ্ঞাতে মুন্নার স্থান তৈরী হয়েছে অর্ধচেতন মনে। কেমন করে যে মুন্নাকে হারিয়ে ফেলেছে তা সে নিজেও জানে না।

মাঝে মাঝে অর্ধচেতন মন তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, মুন্নাকে কাছে নিয়ে আসলে কেমন হয়। আনতে পারেনি। চঞ্চল তার জীবন ছন্দ, বিক্ষিপ্ত তার জীবনবেদ, বাস্তব অবাস্তবের সংঘর্ষ তার। সারা জীবনের উপার্জিত অভিজ্ঞতা, তাই সমতা আসেনি নিজের জীবনে। আসেনি বলেই অপরকে বুকে টেনে নিতে পারেনি।

বুলুকে নিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল মুন্নার ঘরের দরজায়।

জীর্ণ কম্বলে শীর্ণ একটি মানুষ ধুঁকছে। তখনও বোধহয় সেই শীর্ণ মানুষের জিবে লেগে রয়েছে রক্তের নোনা স্বাদ। বাঁশের জানালা দিয়ে এক ফালি ফিকে আলো এসে পড়েছে মুন্নার মুখে। সামনে মাটির মালসায় বোধহয় পানীয় রেখে বেরিয়েছে তার স্ত্রী, অর্থের সন্ধানে অথবা কর্মের সন্ধানে।

নিঃসন্তান মুন্নার শেষ সান্ত্বনা জীবনের প্রাপ্য পরিশোধ করা। তারই অবসর উপস্থিত। নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে দিয়ে কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য শোধ করবে মুন্না।

স্মৃতীশ ডাকল, মুন্না ভাই।

মুন্না চোখ মেলে তাকাল। মৃত্যু পথ যাত্রীর বক্তব্য ফুটে উঠল ক্ষীণদৃষ্টির মাঝ দিয়ে।

কেমন আছ ?

দেহের যন্ত্রনা গোপন করে মুন্না হাসল।

আমি এসেছি।

মুন্না শুধু হাত তুলে একবার বুকে রাখল, আরেকবার কপালে। এই বোধহয় তার বক্তব্য।

বুলু সভয়ে বলল, যক্ষা।

নিশ্চয়ই কিন্তু ব্যবস্থা তো কিছু করতে হবে। অন্তত মৃত্যুর পূর্বে মুন্নার সান্ত্বনা রইবে অচিকিৎসায় মুন্না মরেনি।

একটা থলে হাতে করে মুন্নার স্ত্রী এসে দাঁড়াল। অতিথিদের দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার সজল চোখ।

কোথায় গিয়েছিলে জিজি ? জিজ্ঞাসা করল স্মৃতীশ।

মুন্নার স্ত্রী হাসল। মুন্নার হাসি আর এর হাসি একই ছন্দে গাঁথা।

তোমার ভাই অনেক দিন তোমার পথ চেয়ে বসে ছিল। রোজই বলেছে শিরতীশ বাবু আসলে আমি বাঁচব। কত দিন কত মাস পেরিয়ে গেল। এখন আর আশা নেই। বলেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

আজই তোমার চিঠি পেয়েছি জিজি। নইলে আগেই আসতাম।

মুন্নার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, আর বাঁচব না। বউটাকে দেখ ভাই।

মৃত্যু পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনার স্বরে স্মৃতীশ বলল, তুমি আরাম হবে মুন্না ভাই, ভয় নেই।

মুন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, ভয়! তা নেই। লড়াইয়েব ময়দানে ঘোড় সওয়ারের ভয়ে লড়াই ছেড়ে যারা পালিয়ে আসে আমি তাদের দলে নই।

ইঙ্গিতে তাকে থামতে বলে স্মৃতীশ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মুন্নার স্ত্রী ছেঁড়া মাদুরটা পেতে দিয়ে বসতে বলল।

স্মৃতীশ উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। এখন বসবার সময় নেই জিজি, মুন্না ভাইকে বাঁচাবার চেষ্টা তো করতে হবে।

মুন্নার স্ত্রী উদাস ভাবে চেয়ে রইল স্মৃতীশের দিকে। স্মৃতীশ সেই উদাস করুণ দৃষ্টিকে সহ্য করতে না পেরেই বুলুর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ডাক্তার নিয়ে এখুনি আসছি। তুমি ভয় পেও না জিজি।

চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উভয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন বুলু হতাশ ভাবে বলল, ও আর বাঁচবে না।

জানি তবুও চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা আমার নৈতিক দায়িত্ব। যেদিন আদালত থেকে খালাস হয়ে এলাম সেদিন পাথেয় ছিল না, আহার্য ছিল না। সেদিন ঐ দিনমজুর তার সমস্ত সঞ্চয় আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, বিনিময় প্রত্যাশা করেনি। একথা কোন দিনই ভুলতে পারব না। তুমি বলবে, ও এমন কিছু অপার্থিব নয়, অলৌকিকও নয়। পথ চলতে সহযাত্রী হাত বাড়িয়ে দেয়, স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মের স্বতস্ফূর্ত আবেগে। মানুষ তখন অঙ্ক কষে দেখে না, আবেগের পটভূমিকায় হৃদয় বৃত্তি কতটা প্রবল ছিল। আমিও তা স্বীকার করি। সেই সাথে এ কথা অস্বীকার করি না যে অতীতই আমাদের সামনে চলবার পাথেয় সংগ্রহ করে দেয়।

সারা পথ নীরবে পেরিয়ে এসে বুলু প্রথম কথা বলল বাড়ির দরজায় এসে। বলল, যারা পেছন টানে, তারা নিজেরাও খোঁড়ায় অপরকেও চলচ্ছক্তিহীন করে।

স্বতীশ হেসে বলল, পেছনের টান আছে বলেই মানুষ সামনে চলে। খুঁড়িয়ে চলতে চলতে একসময় এরাই সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বুলু হাসল। কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে এসে হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে রইল।

বিকেলবেলায় প্রবীর শেফালিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল। বুলু পরীক্ষার খাতা দেখছিল। স্বতীশের করণীয় কিছু না থাকায় জামা কাপড় বদলে বের হবার উপক্রম করতেই পাশের ঘর থেকে বুলু জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ ?

রাজদর্শনে।

পরীক্ষার খাতাগুলো গাদা করে সেলফে রাখতে রাখতে বলল, আমিও যাব।

খুশী মনেই স্বতীশ বলল, বেশ, চল।

রাজবাড়ির সামনে এসে স্বতীশ বলল, তুমি গিয়ে মহারাণীর মহলে বস, আমি মহারাজার সাথে দেখা করে যাবার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

পুণ্যলাভ একাই করতে চাও বুঝি? তা হবে না। আমিও যাব মহারাজাকে দেখতে।

দেউড়িতে তিস্তিরি সিং হিন্দী কেতাব পড়ছিল। আগের মতই শালুর পাগড়ি মাথায়, খাকি পোষাক পরিধানে। শুধু বয়স বৃদ্ধির ছাপ রয়েছে মুখে। স্মৃতীশকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল।

কেমন আছ সিংজি?

ভালই। তিস্তিরি হাসল। এ হাসির তলায় অতীতের তিস্তিরির কোন চিহ্নই আজ নেই।

যে ব্যক্তিটি একদিন "ভিখ্ নেহি মিলেগা" বলে পথরোধ করেছিল, সেই ব্যক্তিটির অতি বিনীত ভঙ্গী এবং কর্মচারীসুলভ হাসি দেখে স্মৃতীশ ভাবতেই পারল না, তিস্তিরি সিং-এর আসল চরিত্র কি। হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করে স্মৃতীশ এগিয়ে চলল।

সামনে দরবার ঘর। সিঁড়িতে পা দিয়েই ডাকল, রতিকান্ত।

কোন জবাব পাওয়া গেল না।

পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়াল মহারাজা স্বয়ং।

স্মৃতীশ! মহারাজা উৎফুল্লভাবে এগিয়ে এল। বুলুর দিকে লক্ষ্য রেখে বলল, তোমার সঙ্গে ইনি কে?

সঙ্গী।

মহারাজা প্রশ্ন করল না। দরবার ঘরে বসতে দিল। নিজেও চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, পথ ভুলে বুঝি এসেছ?

স্মৃতীশ জবাব না দিয়ে হাসল।

বক্তা মহারাজা। শ্রোতা দুইজন। অনেক দিন এমন শ্রোতা বোধহয় মহারাজার সামনে আসেনি। বক্তব্য হয়ে উঠল গম্ভীর এবং অনর্গল।

বলল, রাজ্য আমার গেছে, শুনেছ বোধহয়।

আপনার একার নয়, সবারই গেছে।

মহারাজা হো-হো করে হেসে উঠল। দরবারের খাস কামরার কাঁচে বাঁধানো সাজানো পটগুলো হাসির লহরে ঝন্ ঝন্ করে উঠল। তারপর অস্বাভাবিক ভাবে ফিরে এল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। মহারাজা কি যেন ভাবতে থাকে। বুলু অস্থির হয়ে উঠে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্মৃতীশকে কি যেন বলল।

মহারাজা জিজ্ঞাসা করল, নয়নপুরে দু এক বছরের মধ্যে গিয়েছ কি ?

আজ্ঞে না।

মহারাজা নিজের মনেই বলল, মীর-রা বোধহয় নেই। আর থাকলেই বা কি। নয়নপুরের মহারাজার অভ্যর্থনা মিছিলে মীরের তুরী আজ আর শোনা যাবে না। ইতিহাসের উত্থান পতন এমনি ভয়ঙ্কর। মুর্শিদকুলীর দশহাজারী মনসবদার নিত্যানন্দ বাংলার ভুঁইঞাদের সর্বনাশ করে অর্জন করেছিল নয়নপুরের সম্পদ। সারা বাংলার পুঞ্জীভূত অশ্রুতে তাই আজ নয়নপুর ভেসে গেছে।

মহারাজা কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের সেই কামানগুলো আজও আছে কি ? দেউড়ির সেই গুলবাহার কামান ? নেই বোধহয় ! নয়নপুরের অস্ত্রশালায় গজানন কামার হাপরে পুড়িয়ে থাটি লোহার কামান তৈরী করেছিল। সেও দুশ বছর আগে।

আবার মহারাজা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করে উঠল দরবার ঘরের আসবাব।

হরকান্ত ঠাকুরের পুত্র, দরিদ্র পিতার পরিত্যক্ত বিক্রীত সন্তান আমি। পরস্ব অপহরণ করে সৃষ্টি হয়েছিল নয়নপুরের রাজ্য, তার অপচয় ঘটাতে সৃষ্টি হয়েছিল আমার। অপচয় করতে পেরেছি বোধহয়। তবে মনে হয় কি জানো, জমিদারের জমিদারী গেলেই মানুষের দুঃখের শেষ হয় না। জমিদার মানুষ, তার হৃদয় আছে, আভিজাত্যের দম্ভ আছে, বদান্যতার ভেক আছে। তার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, রাষ্ট্র তা দিতে পারে না। রাষ্ট্র তো যন্ত্র, তার হৃদয় নেই। রাষ্ট্রযন্ত্রে ঘুণ ধরে, সে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে দেখে না। সে তার কানুন প্রয়োগ করে। কানুন মানুষকে বাঁচায় না। কায়েমি স্বার্থকে আরও বেশি কায়েম করে।

স্মতীশ বিব্রত বোধ করে বলল, আজকের মত বিদায় চাইছি।

মহারাজার হুঁস ফিরে এল। বলল, তাইতো ! আমার কথাই বলছি। কেন এসেছ তাও জানতে চাইনি ? বড়ই স্বার্থপর আমি। আজকাল কি করছ ?

কিছুই করছি না। করব মনে করছি।

কিছু কর। তুমি তো একক নও, রাজাও নও, বাদশাও নও, তুমি মানুষের

কাছ থেকে দূরে থেক না। মানুষের কাছাকাছি থাকতে হবে। তোমার মত লোকের প্রয়োজন রয়েছে সমাজে। সমাজকে দেবার সামর্থ্যও তোমার রয়েছে। যারা নিতে চায় দিতে চায় না, তুমি তাদের দলের নও। হয়ত স্থান গড়ে নিতে কষ্ট হবে, তাতে হতাশ হবে না। আগুনের শিখা উর্দ্ধেই স্থান করে নেয়, নিম্নপথ বহ্নির পথ নয়।

উত্তেজনায় মহারাজা কথা শেষ করতে পারল না। কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, দেউল ভেঙ্গে গেছে, দেবতার বিগ্রহ স্থানচ্যুত হয়েছে, রয়েছে শুধু কাঠামো। কাঠামো আর বেশি দিন হয়ত থাকবে না, তবুও এস মাঝে মাঝে।

স্মৃতীশ বুলুর হাত ধরে বেরিয়ে এল দরবার ঘর থেকে।

সেখান থেকে মহারাণীর খাস কামরায় এসে উভয়েই প্রণাম করল অবন্তীদেবীকে।

খুশীর উচ্ছৃঙ্খলতায় অবন্তীদেবী জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছ তোমরা ?

ভাল ? তা আছি।

মহারাণী হেঁসে বলল, ভাল আছি বলার অনেক সুবিধা। কৈফিয়ত দিতে হয় না মন্দ থাকার। একটি শব্দ দিয়ে বিশ্বের প্রয়োজন মিটে যায়। কি করছ আজকাল ? শুনেছিলাম, দেশে গিয়ে নাকি চাষ আবাদ করছিলে ?

করছিলাম। সইল না। দেশ তো আমাদের নয়, আমরা কৃপাপ্রার্থীর দল। এদেশে ভিখারী ওদেশে সন্দেহভাজন। ক্ষমতাবিলাসী এই মানুষের দল কাউকেই ভালবাসেনি, না মাটিকে, না মানুষকে। ওরা ভালবেসেছে নিজেকে, পেতে চেয়েছে অর্থ আর ক্ষমতা তাই ভালবাসা পাইনি, ভালবেসেই সুখ পেয়েছি। কাজ দিয়ে সুখ সৃষ্টি করতে পারিনি। কর্মে যেখানে আনন্দ নেই, বসবাসে যেখানে নিরাপত্তা নেই, সেখানে থাকা সম্ভব নয় বলেই চলে এসেছি।

মহারাণী চুপ করে শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, রাজত্ব গেছে জানতো ?

জানি।

আমি ভাবছি ভূমির ওপর অধিকার স্বীকার করে নিয়েই কি মানুষ নিষ্কৃতি পাবে ? অবশ্য এখনও সে অধিকার স্বীকার কেউ করেনি, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত করবে কিন্তু তাতে কি লাভ হবে।

মানুষ খেয়ে বাঁচবে, কর্মের সংস্থান হবে।

অবন্তীদেবী হাসল। বলল, বাংলায় শ্রেণী বৈষম্য নিশ্চয়ই ছিল। শোষক ছিল, পীড়ক ছিল কিন্তু জমিদারকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিলেই কি শ্রেণী বৈষম্য মুছে যাবে, শোষণ শেষ হবে, পীড়ন বন্ধ হবে ?

হবে, তবে সময় সাপেক্ষ।

কিন্তু ততদিন আমরা বাঁচব কি ? সম্পদের কিছু অংশও এতকাল আমাদের দেশেই থাকত, এখন সম্পদের কণিকাও থাকবে না। অভিজাত আর ভূমিদাস শ্রেণী হয়ত লোপ পাবে কিন্তু ধনী-নির্ধন শ্রেণীর লোপ ঘটবে কি কখনও ? বাংলার উৎসব ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তাতে ছিল পরিজনকে ভালবাসার শুভ প্রচেষ্টা। সেই ভালবাসা হারিয়ে সমষ্টিকে আপন করতে চাওয়া কেমন যেন কৃষ্টিবিরোধী মনে হয়। হৃদয়ধর্ম হারিয়ে মানুষ হবে যন্ত্র, যন্ত্রদৈত্যে গ্রাস করবে মানব ধর্ম। কল কারখানা গড়ে উঠছে, প্রশ্ন উঠেছে অর্থবিনিয়োগের, কিন্তু সে অর্থ জোগান দেবার সামর্থ্য রয়েছে কি আমাদের ?

সে দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

রাষ্ট্র যদি দায়িত্ব না নেয় ? রাষ্ট্র যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থে গড়ে ওঠে, সংখ্যাল্প সেখানে হয় নিষ্পেষিত। এত দিন অভিজাতধর্মী সমাজে লঘু গুরুকে শাসন করত। এখন গুরু লঘুকে শাসন করবে। সমতা রইবে বহু দূরে। তাই আমাদের রাষ্ট্র সে দায়িত্ব নেয়নি বলেই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দরিদ্র আরও বেশি লাঞ্ছনাময় জীবনে নেমে যাচ্ছে, আর যাদের অর্থ ছিল তাদের সঞ্চয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এতো মহারাণীর মত কথা নয়।

মহারাণী অনেক দিন আগেই মরে গেছে। তার প্রেতাত্মা নয়নপুরের জলটুঙ্গি প্রাসাদের চত্বরে হয়ত কেঁদে বেড়াচ্ছে। এখানে রয়েছি আমি, ভাঙ্গা দেউলের পূজারী।

মহারাণী মোক্ষদাকে ডেকে জলখাবার আনতে বলল।

বুলু আপত্তি জানাতেই মহারাণী বলল, না, বল না মা। রাজ্য গেছে, সম্পদ গেছে, আছে শুধু মনটা। সেটাও যখন শুকিয়ে যাবে তখন বাঁচা না-বাঁচা সমান হবে।

স্বতীশ বুলুকে থামতে ইসারা করে নিজেও চুপ করে বসে রইল।

এসেছ ভালই হয়েছে। আমার কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে। কি করলে এর সুব্যবস্থা হয় বল দেখি।

বুলু বলল, কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করে দিন।

মহারাণী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলল, দান মানুষের দুঃখ বৃদ্ধি করে। দানের উদ্দেশ্য মহত হলেও প্রাপক মহত্বের পথ থেকে ছিটকে পড়ে যায়।

স্মৃতীশ আশ্চর্য্যভাবে বলল, কি বলছেন?

অতি সাধারণ কথা। আয়াসসাধ্য অর্থ মানুষকে বড় করে। অনায়াসসাধ্য অর্থ মানুষের কর্মক্ষমতাকে হত্যা করে। মানুষ পঙ্গু হয়, পরগাছা হয়। যেদিন দান প্রাপ্তির আশা থাকে না সেদিন ঐ কর্মবিমুখ মানুষ দুর্নীতির পথে পা বাড়ায়। দান সমাজের শত্রু। দান অভিজাতের বিলাস, দরিদ্রের অভিশাপ।

মোক্ষদা খাবারের প্লেট এনে রেখে দিল টিপয়ের ওপর। মহারাণীর কথায় বাধা পড়ল। স্মৃতীশ খেতে খেতে বলল, সত্য সত্যই মহারাণীর মৃত্যু ঘটেছে। যুগধর্মের পাদপীঠে অতীতকে উৎসর্গ করে নতুনের সম্ভাবনা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে!

মহারাণী কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাস্তায় এসে স্মৃতীশ বুলুকে জিজ্ঞাসা করল, কি বুঝলে?

অর্থহানির আশঙ্কায় দুজনেরই মানসিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

এই কি সব?

আমার তো তাই মনে হয়।

আমার মনে হয়, এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে ওদের ওপর অবিচার করা হবে। প্রথম যেদিন মহারাজার সাথে নিরবিছিন্ন কথা বলবার অবসর পেয়েছিলাম, সেদিন তিনি তাসের ঘরের রাজা বলে নিজেকে উপহাস করেছিলেন। তেমনি মহারাণীকে যেদিন জেলখানায় দেখলাম উকিল কৌঁসুলি নিয়ে হাজির হতে, সেদিন তাঁকে নতুন মানুষ মনে হয়েছিল। এই সবগুলো বিচার করলে ওদের সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কেমন যেন ঘোলাটে মনে হয়।

খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে এসে বুলু বলল, একটা ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সি ডাকবার আগে চল আরেক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।

কোথায়?

জেলখানায় অনেক বন্ধু জুটেছিল শুনলাম তাদেরই একজন এখন মস্ত লোক। তার কাছেই যাব মনে করছি। মুন্নার জন্য একটা সিট হয়ত বা জোগাড় হতে পারে কোন হাসপাতালে।

অনিচ্ছার সাথে বুলু বলল, চল, তবে ভরসা নেই।

স্মৃতীশ কোন মন্তব্য করল না, এগোতে লাগল।

বন্ধুর বাড়িতে পা দেবার সাথে সাথেই বুঝতে পারল বন্ধুর বর্তমান অবস্থা একদল পরিষদ সৃষ্টি হবার সুযোগ দিয়েছে। পরিষদের ভীড় ঠেলে তার কাছে পৌঁছাতে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলেও বিলম্ব ঘটিত অসন্তোষ গোপন করে শুকনো হাসি দিয়ে পুরাতন পরিচয়কে নতুন করে তুলে ধরল।

বন্ধু পরিচয়কে অস্বীকার করল না। সাদরে বসতে দিল।

জিজ্ঞাসা করল এখন কি করছ?

বসে আছি। কি করব ভাবছি।

তোমাদের মত স্কলারের ভাববার সময় আছে কি? লেগে পড় কোন কাজে। এমন কাজ কর যাতে জাতির সেবা করতে পার। আমাদের এই দরিদ্র দেশে তোমরাই তো এগিয়ে আসবে। তোমাদের মত লোকের অভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারছি না।

স্মৃতীশ হাসল।

হাসছ? এই দেখ।

স্মৃতীশ বাধা দিয়ে বলল, অমার কথা ভাববার অনেক সময় পাব। যেজন্য এসেছি তার একটা ব্যবস্থা করলে বর্তমানের ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পাই।

স্মৃতীশ সবিস্তারে মুন্নার কথা বলে অনুরোধ জানাল, যদি কোন হাসপাতালে তার কোন ব্যবস্থা করতে পার ভাই তাহলে অচিকিৎসায় সে মরত না।

মনোযোগ সহকারে স্মৃতীশের কথা শুনে বন্ধু বলল, সমস্যা তো একজনের নয়। এরকম কয়েক লক্ষ লোক রয়েছে যাদের সাহায্য দেবার প্রয়োজন। আমরা স্কীম নিয়েছি দু হাজার বেডের কটা হাসপাতাল খুলবার। এখন যা বেড আছে তাতে য়্যাডমিশান পেতে হলে দরখাস্ত করতে হবে। প্যানেলে নাম থাকবে, তারপর টারম্ এলে বেড পাবে।

অতদিন রুগী বাঁচবে তো।

ভরসা নেই। তবুও এছাড়া উপায়ও নেই। একা মুন্নার কথা ভাববার লোক কোথায় বল দেখি। আমাকে একটু বের হতে হবে। রাজভবনে জরুরী মিটিং আছে। চল, তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আসব।

স্বতীশ ক্ষুন্নভাবে বলল, তুমি যাবে উত্তরে আমরা যাব দক্ষিণে, কোথায় নামাবে বল দেখি। আচ্ছা, আজ চলি।

আবার এস কিন্তু। আপ্যায়নের হাসিতে বন্ধুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্বতীশ বুলুর হাত ধরে সোজা নেমে এল রাস্তায়।

বুলু একটিও কথা বলেনি। রাস্তায় এসে বলল, তোমার বন্ধুভাগ্য ভাল।

তাইতো দেখছি।

পরের দিন মুন্নাস্বামীর সাথে দেখা করতে গিয়ে খবর পেল, গত রাতেই সে মারা গেছে। এখনও শশ্মান থেকে লোকজন ফেরেনি।

ধীরে ধীরে স্বতীশ এসে দাঁড়াল গলির মুখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

রাজভবনের জরুরী মিটিং করে বন্ধু ফিরে গেছে।

মুন্নাস্বামী ফিরে গেছে পৃথিবীর মিটিং শেষ করে। এখানে জরুরী কিছু ছিল না, ধীরে ধীরে মিটিং শেষ হয়েছে। একা মুন্নার কথা ভাববার লোক কোথায়! পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের চিন্তা যাদের মাথায় কিলবিল করছে, মুন্না সেখানে একটি বিন্দু মাত্র। মানুষের ইতিহাসে এই বিন্দুর দৈর্ঘ প্রস্থ কিছু নাই, আছে মাত্র সাময়িক অবস্থান। মুন্নার দল রেখাগণিতের অঙ্ক। স্থিতি নাই অনুমান আছে।

ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

বুলু স্কুলে বেরুবার সময় তাকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, শরীর বুঝি ভাল নেই? কোথায় গিয়েছিলে?

শরীর! ভালই আছে। গিয়েছিলাম মুন্নার খবর নিতে। গতরাতে সে মারা গেছে।

চৌকাঠ ধরে বুলু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলল, সব শেষ হল।

হয়নি। হতভাগাদের মৃত্যুই শেষ নয়, তাদের সৃষ্ট হতভাগার দল পেছনে থেকে যায়। তাদের ভবিষ্যত আরও ভয়ঙ্কর।

স্বতীশ উঠে বসল।

বলল, আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ব মনে করছি।

কোথায় যাবে ?

পশ্চিমের সেই কলেজে কাজে যোগ দেব। একটা কিছু কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে না পারলে পাগল হয়ে যাব।

বুলু সন্তর্পনে চলতে চলতে বলল, আমি ফিরে এলে কথা হবে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে বলবার মত কিছুই খুঁজে না পেয়ে উদাস ভাবে বুলু বলল, বেশ যাও। যেখানে থাক খবর দিও।

হাওড়ায় এসে বুলু স্মৃতীশকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেছে। যাবার বেলায় হঠাৎ প্রনাম করতেই স্মৃতীশ হেসে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ ?

ভাবছি, আর যদি দেখা না হয় তা হলে আপশোষ থেকে যাবে।

স্মৃতীশের হাসি কিসের আঘাতে থেমে গেল। জল স্রোতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বসে রইল।

খবর দিতে স্মৃতীশ কখন কার্পণ্য করেনি। কিন্তু বুলুর কাছ থেকে সাড়া-শব্দ ক্রমে ক্রমে না পাবার উপক্রম হওয়াতে স্মৃতীশ চিন্তিত হয়ে উঠল। বুলু শেষ চিঠিতে লিখেছিল, 'জীবনের অনুভূতি হয়ত তোমার আমার এক নয়।' নয় বলেই চিঠি লেখা বন্ধ করতে হবে কি !

প্রতিদিন ডাক পিওনের প্রত্যাশায় বসে থেকে বিফল হয়েছে। মাসের প্রথমে মুন্নার স্ত্রীর নামে প্রেরিত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পেয়েছে আর পেয়েছে শেফালির চিঠি, তাতেও বুলুর বিষয় সে কিছু লেখেনি। নিজেও যে শেফালিকে বুলুর বিষয় লিখবে, এ অভিপ্রায় মনে জাগলেও, দুর্বলতাকে অপরের চোখের সামনে স্পষ্ট করে ধরতে চায়নি। এদিকে গ্রীষ্মের অবকাশ সামনে, সে স্থির করতে পারেনি এই অবকাশ কালে কোথায় যাবে। অধৈর্য্য হয়ে শেফালিকে লিখল, অনেক দিন বুলুর সংবাদ জানিনা। সে কেমন আছে জানিও।

শেফালির পত্র এল। সে লিখেছে বুলু বহাল তবিয়তেই আছে, বর্ত্তমানে বাসা ছেড়ে হোস্টেলে বাস করছে।

স্মৃতীশ বুঝতে পারল, বুলুর নীরবতা স্বেচ্ছাকৃত। সেও স্থির করল, নীরবতার মাঝ দিয়েই পুরাতন পরিচয়ের ব্যাপকতা রোধ করবে।

কিন্তু বিচারে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের অবকাশ আরম্ভ হতেই তল্পীতল্পা বেঁধে সুখদার কাছে যাবে স্থির করে স্টেশনে এসে টিকিট

করবার সময় কেমন যেন ভুল হয়ে গেল। কল্যাণের টিকিট চাইবার বদলে কলিকাতার টিকিট কিনে নিজে নিজেই ফোঁপাতে লাগল।

কলিকাতায় এসে উঠল হোটেলে।

দেখা করে এল, প্রবীরের সাথে। জিজ্ঞাসা করল না, বুলু কোথায়।

শেফালির অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে প্রবীরের বাসা থেকে না খেয়েই হোটেলে ফিরে এসে শুয়ে রইল সারাদিন। ভেবে ঠিক করতে পারল না পরবর্তী কর্মপন্থা। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, নীতিশের কাছে যাওয়াই যুক্তি যুক্ত। যাবার আগে মহারাণীর সাথে দেখা করা নৈতিক কর্তব্য মনে করে, বিকেল বেলায় এসে দাঁড়াল রাজবাড়ির দেউড়িতে।

দেউড়িতে তিন্তিবি সিং নেই, বাগানের চিহ্ন মুছে গেছে ইঁটের রাজ্যে। বাগানের বুকে উঠছে নতুন সারিবদ্ধ গৃহ।

স্মৃতীশ থমকে দাঁড়াল। ভুল হয়নি তো। ডান দিকে চেয়ে দেখল দরবার বাড়ি তেমনি আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দার তলায়।

পুরাতন ভঙ্গীতে ডাকল, রতিকান্ত।

পর্দা নড়ে উঠল। এসে দাঁড়াল মহারাজা।

পলিত কেশ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ক্ষীণ দেহ, অতীতের কঙ্কাল।

কয়েকটি মাসের ব্যবধানে মানুষের এত পরিবর্তন হতে পারে একথা স্মৃতীশের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবুও এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

কে? স্মৃতীশ। এস ভাই।

হাত ধরে মহারাজা দরবার ঘরের সোফায় বসাল।

উৎকণ্ঠিত ভাবে স্মৃতীশ বলল, এসে তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, বাড়ি ভুল হয়নি তো, ভয়ে ভয়ে এসেছি।

মহারাজা হাসল। সে দিনের মত হো-হো করে অট্টহাস্য নয়।

বলল, মহারাজাও মানুষ, তাদেরও বাঁচতে হয়। কয়েক বিঘে জমি অকেজো পড়েছিল। কয়েক খানা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী করছি, ভাড়ায় দিলে নিশ্চিন্তে জীবন কেটে যাবে। সিকি বাংলার মালিকানা না থাকলেও তার ভগ্নাংশ রইল। নয়নপুরের রাজত্ব রইবে কয়েক বিঘে জমির বুকে।

স্মৃতীশ হেসে বলল, স্কীম মন্দ নয়।

আর বল না, এ সব কি আমার মাথায় খেলত। তোমার সেই যে সঙ্গী, সেই এই স্কীম দিয়েছিল মহারাণীকে। তাও হত না, মহারাণীর লুকানো কিছু ছিল, তাই হচ্ছে। একেই বলে কপাল।

মহারাজা নির্লিপ্তভাবে কথা বলে চলছিল, কিন্তু শ্রোতার মুখের চেহারা ইতিমধ্যেই বদলে গেছে, সে অস্থির ভাবে বলল, আজ অনেক কাজ রয়েছে। মহারাণীর সাথে দেখা করে ফিরে যাব। আরেক দিন আসব।

স্মৃতীশের ভাবান্তর লক্ষ্য করে মহারাজাও বিস্মিত হল। শুধু সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে বলল, বেশ, আবার এস।

স্মৃতীশ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

অন্দরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে সে যে কি করবে ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থেকে পেছন ফিরে ইট কাঠের স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে দেউড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দেউড়ির সামনে এসে তার মনে হল, তার দেখবার ভুল হয়ত ঘটেছে। যাকে দেখেছে সে হয়ত বুলু নয়, যার সাথে দেখেছে সে হয়ত মহারাজকুমার নয়। হয়ত তার অচেতন মন বিশ্বশুদ্ধ গোপন চিন্তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে। থমকে গেল স্মৃতীশ। মনে হল, আবার ফিরে গিয়ে দেখে আসে। তাও পারল না। ফিরে এসে নামল ফুটপাতে।

হোটেলে ফিরে এসে লিখল সুদীর্ঘ চিঠি।

সকাল বেলায় চিঠি ডাকে দিয়ে কলকাতা পরিত্যাগের জন্য স্মৃতীশ প্রস্তুত হয়ে নিল। শেফালির সাথে দেখা করে বলে এল, আজই সে পুনায় যাবে। প্রবীরকে নেমতন্ন জানাল, সপরিবারে তার কর্মস্থলে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে।

গাড়ি রাত সাড়ে সাতটায়।

কেনা কাটা শেষ করে ছয়টার সময় হোটেলে তার নির্দ্দিষ্ট কামরায় এসে থমকে গেল।

থামলে কেন? বুলু হাসল।

তুমি?

হাঁ আমি। পাঁচটার সময় তোমার চিঠি পেলাম। বৌদির কাছ থেকে

তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করে সবে মাত্র এসেছি।

বিব্রত ভাবে স্মৃতীশ বলল, বেশ করেছ।

বেশ নয়। কৈফিয়ত নিতে এসেছি। এ চিঠি সজ্ঞানে তুমি লিখেছ? মহারাজার কথা শুনে বুঝেছিল আমি মাঝে মাঝে রাজবাড়িতে যাই। আর অন্দরের পোর্টিকোতে আমাকে আর রাজকুমারকে দেখে বুঝলে, বিষয় বস্তু আলাদা পথ ধরেছে। চোদ্দবছর পর এই বুঝি তোমার জ্ঞান লাভ হল?

স্মৃতীশ জবাব খুঁজে পেল না।

উত্তর দাও। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বুলু।

দেবার মত উত্তর নেই। অন্তত মুখে বলবার মত নেই।

চিঠি লিখে জানাবে, বেশ।

বুলু উঠে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল, বলতে পার, আমি কি পেলাম? বাবা মরবার সময় যাদের দায় তুলে দিয়ে গিয়েছিল তাদের দায় বহন করতে করতে যেদিন আয়নায় নিজের চেহরা প্রথম দেখলাম, সেদিন মনে হল, যাক, আর বলতে চাই না।

স্মৃতীশ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে আবেগের সঙ্গে বলল, এখনও সময় বুঝি হয়নি।

এ জীবনে হয়ত হবে না।

হোটেলের চাকর এসে জানাল, ট্যাক্সি এসে গেছে।

স্মৃতীশ হোল্ডঅল আর স্যুটকেশ হাতে তুলে নিতেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুলু বলল, তোমার যাওয়া হবে না। যাবার অধিকার সেই দিনেই পাবে যেদিন তোমারও সময় হবে।

স্মৃতীশ হেসে বলল, সময় হলে তুমিও তো যাবে।

নিশ্চয়।

স্মৃতীশ গম্ভীরভাবে বলল, তা হলে সে সময় আজ উপস্থিত তুমিও চল। দুজনে মাকে প্রণাম জানিয়ে আসব।

নীচে ট্যাক্সিওয়ালা তাগাদা দিল।

ভাঙ্গা দেউলের কাঠামো রয়েছে বুলু। আর তো কিছু নেই। বলে স্মৃতীশ হোল্ডঅল হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে থাকে, তার পেছন

পেছন স্যুটকেশ হাতে তুলে নিয়ে বুলু বলল, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে এবার।

তিনশ বছর। তিনশ বছরের ইতিহাস।

আন্দুরায় নির্মূল হয়ে গেছে।

ভেঙ্গে গেছে মধ্যযুগের অর্থনীতির বুনিয়াদ।

নতুন সমাজের বুনিয়াদ পত্তন হবে বুঝি বাংলার ভাঙ্গা দেউলে।

ছুটে চলেছে বোম্বাই মেল।

প্রথম শ্রেণীর জনহীন কক্ষে দুইটি যাত্রী। জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে অনেক দূরে যেখানে আশার ক্ষীণ আলো ফুটে উঠবার সম্ভবনা রয়েছে।

নয়নার মোহনায় মাটি কেটে তুলবার লোক আবার বুঝি আসবে।

ভাবতে ভাবতে স্মৃতীশ ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলল বুলুর কণ্ঠস্বর।

কি ভাবছ?

স্মৃতীশের গাম্ভীর্যের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল হৃদয়াবেগ। হঠাৎ আকুল আবেগে বুলুর মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরে বলল, ভাবছি, ভাবছি। বাদশা-বেগম রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, নফর এসেছে পাদপীঠে। নফর মিশে গেছে মানুষের স্রোতে, ভাবছি সেই মানুষের স্রোতে আমার তোমার স্থান কোথায়!